সূর্যোদয়

মেজর (অবঃ) এম এ জলিল

সূর্যোদয়

মেজর (অব.) এম এ জলিল

প্রকাশনী

সত্য প্রকাশ

সূর্যোদয়
মেজর (অব.) এম এ জলিল

উৎসর্গ	:	সাহিত্যচর্চায় আমাকে যে নামটি সর্বদা অনুপ্রাণিত করে সেই 'মিতু'কে।
গ্রন্থস্বত্ব	:	গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত।
প্রকাশক	:	সত্য প্রকাশ, ঢাকা।
প্রকাশকাল	:	১৯৮২ সাল।
মূল্য	:	৫৫০ টাকা মাত্র।

লেখক 'মেজর জলিল' প্রয়াত হওয়ায় এবং ওনার উত্তরাধিকারগনের সঙ্গে যোগাযোগের কোন মাধ্যম না পাওয়ায়, বিপ্লবী চেতনা থেকে পাঠকদের কাছে অজানা ইতিহাস পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে বইখানা সত্য প্রকাশ কর্তৃক প্রকাশিত হল। বইটি যদি কখনো লেখকের উত্তরাধিকারগনের দৃষ্টিগোচর হয় এবং বইয়ের স্বত্ব নিয়ে দাবি থাকে তাহলে অবশ্যই সত্য প্রকাশের মেইল কিংবা ওয়েবসাইটে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমরা আপনাদের দায় দেওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকব, ইনশাআল্লাহ।

Sottoprokash.com
sottoprokash36july@gmail.com

নিবেদন

আমি একজন কথা শিল্পী নই। কথার পর কথা সাজিয়ে মালা গাঁথা আমার কাজ নয়। লেখকের সুখ্যাতি অর্জনের বাসনা নিয়ে কখনই আমার এ যাত্রা নয়। ফলে আমার মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকের সব গুণাবলি খুঁজতে গেলে হতাশাই বাড়বে মাত্র। সামাজিক সংঘাত থেকে প্রচণ্ড একটা আবেগ যখন বাসা বেঁধে ক্রমে বেড়ে উঠতে থাকে, তখন তা আমাকে অস্থির করে তোলে। প্রকাশের ব্যর্থতায় তা আমার মাঝে গুমরে গুমরে কাঁদতে থাকে। যে কান্না আমাকে রাইফেলের বদলে কলম ধরায়। এ বেয়াড়া আবেগ আমার আশৈশব জীবন সংগ্রামে উৎসারিত। সন্ধ্যানদীর গভীরতার মাঝে ধাবমান প্রচণ্ড স্রোতধারা, নদীকূলের অবারিত খোলা মাঠ, উন্মুখ আকাশ আর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা নারকেল গাছের সারি-এ আবেগের পরিবর্ধক। জীবন সংগ্রামের মাঝে যে কান্না তাতে লালিত হৃদয় সমাজের সামান্য অসংলগ্নতায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সঞ্চারিত আবেগ তাই নিঃসৃত হয় কলমের ডগায়। যে আবেগ সুনিপুণ হাতের ছোঁয়া বর্জিত সদ্যপ্রসূত কাঁচা গন্ধ নিয়েই উৎসারিত হয়। জন্ম দেয় সূর্যোদয়ের।

বিরাট পরিসরে একটি জীবনের গল্প বলতে গিয়ে উপন্যাসের আবির্ভাব হয়েছে। উপন্যাসের আটপৌরে নিয়মাবলি হয়তো এখানে অনুপস্থিত একটা ব্যাপক পরিসরে জীবনের ছবি অঙ্কনের এটাই প্রথম দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। যে প্রচেষ্টায় অজ্ঞতা যথেষ্ট থাকলেও আন্তরিকতার অভাব নেই। পাত্র-মিত্রের মনন জগতের বিশ্লেষণে কিংবা তাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যাপক চিত্র ও সংলাপের মধ্য দিয়েই সমাজের ছবি আঁকা হয়। কিন্তু এখানে ঘটনাই প্রধান। এবং তার গতি এত দ্রুত যে তাকে তুলে ধরতে গিয়ে পাত্র-মিত্রের মাঝে সহজ সন্তরণের পরিবর্তে বর্ণনার আশ্রয় নিতে হয়েছে প্রচুর। আর ঘটনা এখানে শুধুমাত্র তুলে ধরা, সমাজজীবনের অন্তর্ভুক্ত পাত্র-পাত্রীর দৈনন্দিন জীবননির্ভর নয়। এ ঘটনা এগিয়ে চলেছে রাষ্ট্রক্ষমতা ও তার আওতার মধ্য দিয়ে। সৌন্দর্য ও মাধুর্যে ভরে তোলার ইচ্ছা এখানে কম ছিল না। কিন্তু সদ্য স্বাধীন, যুদ্ধোত্তর এক দেশের আশাহত মানুষের যে যন্ত্রণা সে যন্ত্রণায় বিদগ্ধ এ গল্পের নায়ক তাই সংযত ও সুকুমার ললিত-চরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি। তার সমগ্র উপস্থিতিতে তারুণ্যের কাঁচা আবেগ বাসা বেঁধে আছে যা প্রচণ্ড বেগে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। যুবক মনের অস্থিরতা মনে হতে পারে। কিন্তু তখনও তো এদেশের বাতাস থেকে বারুদের গন্ধ মিলিয়ে যায়নি। যুদ্ধের ভয়াল ছাপ ছড়িয়ে রয়েছে যত্রতত্র। তাই যুদ্ধের ময়দানে প্রেম থাকলেও প্রেমের সুমধুর সংগীত থাকে না।

ইতিহাসের একটা সময়ের ঘটনাকে তুলে ধরতে গিয়ে দলীয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি এসে পড়েছে, ঘটনাকে আরো বাস্তবতা ইতিহাস

গ্রাহ্য করার জন্য। একটা নির্দিষ্ট সময়ের ঘটনাকে সে সময়ের অবস্থান দিয়েই দেখা ভালো। পরিবর্তিত পরিস্থিতি দিয়ে দেখলে ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। স্থান-কালকে অতিক্রম করে কোন বস্তুরই উপস্থিতি নেই। এমনি উপন্যাসে একটা বিশেষ সময়নির্ভর সমাজকে চিত্রিত করতে গিয়ে রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব চলে আসতে বাধ্য। হয়তো ভাষার আবরণে তা ঢেকে দেয়া যেত কিন্তু জীবন মানেই যেখানে লড়াই, সেখানে কাপড়ের আড়ালে অস্ত্র লুকিয়ে রাখা বীরত্বের পরিচায়ক নয়। অবশ্য আজকের যুগে কৌশল যুদ্ধ জয়ের বিরাট হাতিয়ার। তবু ঘটনা বিবৃত করতে গিয়ে দলীয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না আসলেই ভালো হতো।

শেখ মুজিবকে একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে মেনে নিতে কোনো দ্বিধা নেই এবং তা প্রকাশ্যে উচ্চারণ করার মাঝে দলীয় রাজনীতি গৌণ। এর অর্থ এ নয় যে, শেখ মুজিব সকল দোষত্রুটিমুক্ত ব্যক্তিত্ব। বাঙালি জাতি বহুদিনের ব্যর্থতার গ্লানিকে মুছে ফেলার জন্য সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিল তিল করে মুজিবকে গড়ে তুলেছিল। তাঁকে নিয়ে রচনা করেছিল অজস্র রঙিন স্বপ্ন। অথচ যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে জনতার সে আশা ধুলিসাৎ হয়ে গেল। ফলে প্রশ্ন এসে- যায় মুজিব কি সত্যি স্বয়ং অক্ষম ছিলেন? নাকি তাঁর চারদিকের পরিবেশ তাকে অক্ষম করে তুলেছিল। যে নেতাকে সামনে নিয়ে একদিন আমিও স্বপ্ন দেখেছি। অস্ত্র হাতে হানাদার বাহিনীর মোকাবিলা করেছি। ত্রিশ লক্ষ মানুষের রক্ত আর দু'লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত যে মানুষটিকে সামনে রেখে এদেশের মানুষ বিলিয়ে দিতে পেরেছিল; নিঃসন্দেহে তার কাছে প্রত্যাশা ছিল প্রচুর। সে আশা যে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল তার জন্য দায়ী কারা- তা অবশ্য বিচার করে দেখতে হবে। এ ব্যর্থতা কি শুধু তাঁর শ্রেণি চরিত্রের দান না তাঁর পারিপার্শ্বিকতার যে চরিত্র তার দান? প্রদীপের নিচেই যেমনি অন্ধকার তেমনি তাঁর ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠেছে এক কালো দানব। যা তাঁর সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়েছে। ইতিহাসের কাছে বিচারের কাঠগড়ায় আসামি হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। ইতিহাস তার পাওনা থেকে যেমনি তাঁকে বঞ্চিত করতে পারবে না তেমনি পরাজয়ের গ্লানি থেকেও অব্যাহতি দিতে পারবে না। বিশেষত যে চক্র তাঁর ছত্রছায়ায় বসে কালো টাকার পাহাড় বানিয়েছে, নেতা মুজিবের সাথে সাথে ব্যক্তি মুজিবকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে, সমাজে তাদের চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যতের সংগ্রামে বিজয়ের ফসল যাতে আর বিনষ্ট না হয় অন্তত সে প্রয়োজনে।

প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিত্ব আসাতে আমাদের কারও আহত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে কাউকে হেয় করার কোনো ইচ্ছা

এখানে নেই। আজো এখানে এই দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ হয়ে পুনরায় স্বৈরতন্ত্র ও জাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে। এ লড়াইয়ে যাদের বন্ধু হিসেবে পেতে চাই তাদের মাঝে এ হেন দোষত্রুটির পুনঃ আবির্ভাব ঘটুক তা নিশ্চয়ই কেউ কামনা করব না।

এমনি ধরনের ঘটনানির্ভর কাহিনি প্রচণ্ড বিতর্কের জন্ম দিতে পারে তবু আমাদের সাহিত্য এদের সগর্ব উপস্থিতিতে ভরে উঠুক। প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী লেখক কবি সাহিত্যিকদের কাছ থেকে সমকালীন রাজনীতিকে কেন্দ্র করে প্রচুর গল্প বা উপন্যাসের প্রকাশ দেশবাসীর কাম্য। সচেতন পাঠক সমাজের কাছে মতামতের প্রত্যাশা রইল যা সার্বিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক হবে। ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে জেলে থাকাকালে এ কাহিনিটি লিখেছিলাম। এ গ্রন্থ প্রকাশে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম ও সময়োপযোগী উপদেশ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা সূত্রে বাঁধা থাকলাম।

২০ আগস্ট '৮২ ঢাকা

মেজর এম এ জলিল

প্রথম অধ্যায়

ঐ শোন কিসের আওয়াজ।

'এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে, জিততে হবে, জিততে হবে-

আরে! আঁতকে উঠছ কেনো, ওতো গানের আওয়াজ।

গান হয় হোক, তবু ভালো, কিন্তু ও যদি হয় স্লোগান প্রাণ আঁতকে ওঠে। মিসেস জামান বললেন- সেদিন রাতে নবাবপুর রোড ধরে গাড়ি চেপে আসছি গুলিস্তানের দিকে, হঠাৎ একটা মিছিলের সামনে পড়ে গেলাম। সন্দেহ হলো, খুঁজে পেতে মিছিলটা আমাকে ধরে ফেললো বুঝি। ছোট রাস্তায় যেন তুফান নেমে এলো। এক রত্তি জায়গা ছিল না। হাজার হাজার কণ্ঠে শুনলাম-'লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। 'বিপ্লব বিপ্লব সামাজিক বিপ্লব'। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'। আমি তো ভয়ে জড়োসড়ো, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম মিছিলটি যখন জেলখানার দিকে চলে গেল। ওরা কারা বলোতো?

ভার্সিটির বখাটেগুলো ছাড়া কারা আবার?

তুমি একি বলছো? ভার্সিটির ছেলেগুলো বখাটে নাকি? স্বাধীনতার আগে তো ওদের মাথায় তুলে নাচতে, আর এখন দেখছি নামও শুনতে পাচ্ছো না। তখনকার ব্যাপারই আলাদা। বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে সে ছিলো জাতীয় সংগ্রাম। এখন তো আমাদের ক্ষমতা আমাদেরই হাতে।

ক্ষমতার সাধ যদি মিটেছে, তাহলে ছেলেদের উপর রাগ কেনো? এই ছেলেরাই তো আমাদের উপকার করেছে, ক্ষমতা কেড়ে এনে দিয়েছে। বাংলাদেশের জন্ম না হলে এতো অর্থ ও প্রতিপত্তি কোত্থেকে হতো তোমার? কথাটি সত্যি। অন্তত একটি কারণে ওদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। '৭১-এর সেপ্টেম্বরের দিকে মুক্তিযুদ্ধে যখন খুব রকম মার খাচ্ছি আমরা, ভারত থেকে বাংলাদেশে আসতে চেয়েছিলাম একবার। আত্মসমর্পণ করবো বলে মনে মনে স্থির করেছিলাম ব্যাপারটি ধরে ফেলেছিলো ছেলেরা, কিছুতেই আসতে দেয়নি। এজন্য কৃতজ্ঞতাবোধ অবশ্যই রয়েছে। তাই বলে স্বাধীনতার ছয় মাস যেতে না যেতেই আবার এই সংগ্রাম, সংগ্রাম চিৎকার কেনো? দীর্ঘ পঁচিশ বছর সংগ্রাম করলাম, আর এখন যদি সুস্থে আয়েসে ক'বছর না কাটাতে পারি-বলে বিজ্ঞের মতো ইজি চেয়ারে চিৎ হয়ে পড়লেন জামান সাহেব। যেন সত্যি সত্যি পঁচিশ বছর সংগ্রামের ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

কী বললে? পঁচিশ বছর সংগ্রাম করেছো তুমি? হাসালে দেখছি। মনে আছে '৭০ সালে ইলেকশনের আগে তুমি মুসলিম লীগ করতে?

করতাম। কপালগুণে শেখ মুজিবকে পেয়েছিলাম। ঠিক সময়েই দলে ডেকেছিলেন। দোয়া করি, তোমার দীঘল চুলের মতোই দীর্ঘ হোক তার জীবন।

হেসে ফেলেন ফরিদা বেগম।
কত যত্নে এ চুল দীর্ঘ হয়েছে জানো?
ততো যত্নেই জীবন দীর্ঘ করবো তাঁর। আর এজন্য চাই ঐ বখাটেদের দমন। এরাই অনর্থের মূল। অবশ্য আওয়ামী লীগও জানে ঐ সব বখাটেদের কি করে শায়েস্তা করতে হয়।
শুনিই না, কি করে তা করবে?
সব কথা কি খুলে বলার মতো? শুধু শুনে রাখো ভারতের সাথে আমাদের পঁচিশ বছরের যে চুক্তি হয়েছে, সে চুক্তি আমাদের অন্তত পঁচিশ বছরের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার চুক্তি। যখনই বিপদে পড়বো, তখনই তারা আমাদের সবকিছু দিয়ে সাহায্য করবে। তাছাড়া সীমান্ত চুক্তি করে আমাদের সীমান্ত তো খুলেই দিয়েছি-এখন চিন্তা কিসের? বখাটেদের শায়েস্তা করতে প্রয়োজন হলে ডাক দেবো, ছুটে আসবে তারা।
কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনীকে এ দেশের মানুষ তো দু'চোখে দেখতে পারে না। বিজয়ের পর পরই না একজন সেক্টর কমান্ডার বেঁকে বসলো সেদিন। তাকে গ্রেপ্তার করলে সারা দেশের মানুষ যে রকম রাস্তায় নেমে গেলো স্লোগান দিতে দিতে, আবার যদি আসে, সব মানুষ ক্ষেপে যাবে না মনে করো?
মানুষ ক্ষেপবে! কোন মানুষ ক্ষেপবে? সবাই তো আওয়ামী লীগ করে। কি যে বলো তুমি! সবাই কি আওয়ামী লীগের হয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ করেছে সেদিন? আরে, তুমি যে কিছুই জানো না দেখছি। মুক্তি বাহিনী যুদ্ধ করেছে নাকি? ওরাতো পিছনে পিছনে ছিলো, যুদ্ধতো করেছে ভারতীয় বাহিনী।
আমার চাচাতো ভাইটি তো যুদ্ধ করেই শহিদ হলো। তাছাড়া স্বাধীনতার পর সি. পি. আই-এর সেক্রেটারি জেনারেল ঢাকায় এসে কি বলেছিলেন মনে নেই? সে মিটিং-এ নাকি রোজী গিয়েছিলো, ওর কাছেই শোনা। ডায়াসে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার এক পর্যায়ে যখন তিনি সমবেত জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন বলুন তো আপনারা, স্বাধীনতার এই মহান যুদ্ধটি প্রকৃতপক্ষে কারা করেছে? তাকে খুশি করার জন্য সবাই চেঁচিয়ে উঠেছিলো-'ভারত' 'ভারত' বলে। সে তার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, বিনা স্বার্থে কেউ কাউকে সাহায্য করে না-এ তথাটি মনে রাখবেন।'
এতো খোঁজখবর রাখেন তাঁর স্ত্রী-অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রাইলেন জামান সাহেব। তারপর বললেন-আসলে ঐ স্লোগানের ভয়ই পেয়ে বসেছে তোমাকে। ঐ ভয়েই আজগুবি সব তথ্য-যুক্তি বের করছো।
ফরিদা বেগম স্বামীর এই কথাগুলো যেন শুনেও শুনলেন না। তাঁর চোখে তখন নবাবপুর রোডের সেই বিশাল মিছিল, কানে তাঁর হাজারো কণ্ঠে উচ্চারিত সেই সংগ্রামী স্লোগান। স্বামীর কথার উত্তরে অসাড় কণ্ঠে শুধু বললেন-হুঁ। এই হুঁ ধ্বনিটি মন্ত্রী সাহেবের শ্রুতি এড়ালো না।
জীবনে রাজনীতি করেননি ফরিদা বেগম। কিন্তু এক রাজনৈতিক পরিবারেই তাঁর জন্য। দুটো ভাই তার আজো সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী সংগঠনের সাথে জড়িত। ইন্টারমিডিয়েট

পাস করার পর আর পড়াশোনা হয়নি তাঁর। নিজের চেষ্টায় যা কিছু পড়েছেন, আর নিজের চোখে যা দেখেছেন সে আলোকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারাটি যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনি। তার জীবনেই তিনি মুসলিম লীগের পতন দেখেছেন। পতন দেখেছেন আইয়ুব ইয়াহিয়া খানের একনায়কত্বের। সবকটি পতনের মূলেই যে ছিলো এই গণমানুষের বিক্ষোভ তা ভুলেননি মোটেও। সেদিনকার মিছিলে উচ্চারিত শ্লোগান আর মিছিলের ব্যাপারটিকে তাই এড়িয়ে যেতে পারেন না। এই সাঁঝ-সন্ধ্যায় বেলী রোডের প্রকাণ্ড বাড়ির গ্যালারীতে বসে স্বামী-স্ত্রীতে যখন গল্প করছেন, চাকর-নফর সব তখন নিচের তলায় কাজে ব্যস্ত, উনিশ বছরের একমাত্র মেয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গিয়ে এখনও ফেরেনি। স্বামী-স্ত্রীর গল্পের মাঝে হঠাৎ দূর থেকে ভেসে আসা গানের সুর তাদের আসর গুলিয়ে দিয়ে সূচনা করেছে এক নতুন উৎকণ্ঠার। মন্ত্রী স্বামীর আশ্বাসের বাণী তাকে শান্ত করতে পারেনি। একটু একা থাকার ভাবনায় নিজের ঘরে যাওয়ার ছুঁতো খুঁজছিলেন যখন, বোতল আর গ্লাস নিয়ে বেয়ারা এসে উপস্থিত হলো তখনই। জ্বলে উঠলেন-ফরিদা বেগম। টানো আর তোমার রেঙ্গুনের স্বপ্ন দেখো।

বলে উঠে পড়লেন তিনি।

রোজীর ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় আবারো কানে এলো তাঁর একই কথার গানের গুনগুনানি-এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে, জিততে হবে, জিততে হবে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুলের বেণী খুলতে খুলতে গুনগুনিয়ে গান গাইছে রোজী আর ভাবছে তাদের রাস্তারই এক বাসায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যে চমৎকার এই গানটি শুনলো, সে গানের কথা আর গায়কের চোখ কোনটি তার ভালো লেগেছে বেশি।

ফরিদা বেগম অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মেয়ের দিকে, আর স্মৃতি হাতড়ে খুঁজছেন সেদিনকার মিছিলে এরকম হাজারো তরুণ মুখের মধ্যে নিজের মেয়ের মুখটিও তিনি দেখেছেন কিনা।

মন্ত্রী সাহেবের নেশাটি আজ যেন ধরছে না। প্রতিরাতে নেশায় চেপে ঘুম দেন আয়েসে, এপাশ ওপাশ করেও ফল হচ্ছে না আজ দু'পাশেই মিছিলের মুখ, উত্তোলিত হাত, ক্রুদ্ধ শ্লোগান। বালিশটাকে ভাঁজ করে কানে চেপে মিছিলের কণ্ঠ মর্মে প্রবেশের পথ রুদ্ধ করলেন তিনি। কাজ হলো না তাতেও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কমলাপুর রেল স্টেশনের ওপারে বাসাবো। দশ মাস ধরে জাফর আছে সেখানে, মায়ের দূর সম্পর্কের এক ভায়ের বাসায়। জাফরের এই মামা চাকরি করেন বাংলাদেশ রেলওয়েতে। কেরানি। হালের বাজারে ভালো বাড়িতে থাকার জো নেই তার, টিনের ছাউনি হলেও এ বাসা একেবারে মন্দ নয়। রুবী, ববি সারাক্ষণ লেগে আছে বাসা পরিষ্কার রাখতে সামনের খোলা জায়গাটুকুতে গন্ধরাজের চারা লাগিয়ে ছোটখাটো একটা বাগানের আয়োজন করেছে। রুবীর বয়স উনিশ, ববি বারোতে পড়েছে মাত্র। তাদের বড়ো ভাই সেলিম কায়েদে আযম কলেজে পড়তো বি-এ ক্লাসে। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়ে শহিদ হয়েছে। ছেলের শোকে আজও মাঝে মাঝে মূর্ছা যান শরীফ সাহেব। অবশ্য এ রকম শোকগ্রস্ত বাপের অভাব নেই এ দেশে। জাফরের মধ্যেই হাতড়ে খুঁজে ফেরেন। তিনি নিজের ছেলেকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রী রুবী। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হলেও সুন্দরী সে। নিজের রূপ প্রকাশে বরাবর অনিচ্ছুক তার বাপ যেমন অনিচ্ছুক তাঁর বেতনের পরিমাণ প্রকাশে।

রুবী রাশভারী। তাই বলে হাসি-ঠাট্টা আর কৌতুক করতে যে একেবারেই জানতো না তা-ও নয়। সে হাসতো, খুব হাসতো, মুক্তা ছড়ানোর মতো হাসতো। জাফর তাকে একবার অমনি হাসতে দেখেছে আর সেদিন থেকে রুবীর চরিত্রে অন্য একটি বিশেষ গুণের সংযোগ ঘটে যা সর্বযুগে, সর্বকালে, সর্বদেশে নারীকে অপূর্ব করে তোলে। শরম-রাঙা শরম, লাজুক শরম। সেদিনের ঐ শরম-রাঙা হাসিই রুবীর সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়। রুবী তো নিজে দেখেনি, জাফর দেখেছে, জাফরকে দেখতে দেখেছে সে, দেখেছে জাফরের চোখে মুখে নিজের রাঙা-মুখ আলোর প্রতিফলন।

বড় একটা বাইরে যায় না সে, আগে সিনেমায় যেতো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যেতো, বান্ধবীদের বাসায় যেতো। জাফর এ বাড়িতে আসার পর একদম কমিয়ে দিয়েছে বাইরে যাওয়া। নিজে ভালো গায়, গান গাওয়ায় সুখ্যাতি আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু এসবে আর যোগ দেয় না সে তেমন। স্বাধীনতার পরে সূর্যোদয় আজ এই প্রথম বিপ্লবী একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে দেখা গেছে তাকে। সাথে ছিলো রোজী। বন্ধুদের কাছে রুবী, রোজী সমভাবে উচ্চারিত। একই রকম দেখতে, যমজ বলে ধরে নেয় অনেকেই।

সৌন্দর্যের দিক থেকে অভিন্ন হলেও স্বভাবের দিক নিয়ে তারা ভিন্ন রোজী অস্থির, চঞ্চল, হাল ফ্যাশন আর আধুনিকতার প্রতি ঝোঁক তার বেশি। নিয়মিত ইংরেজি সিনেমা দেখে অতিরিক্ত প্রশংসা, আর না দেখেই বাংলা সব সিনেমাকে ইচ্ছেমতো নিন্দা করতে করতে কষ্টে-সাধ্যে, যত্নে আয়াসে আধুনিকা হয়ে গেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের নটি মাস ভারতে ছিলো, মন- মানসিকতায় হলিউড থেকে বোম্বাই হয়ে দেশে ফিরে সে এখন পূর্ণ আধুনিকা। পোশাক আর প্রসাধন তার কাছে নিজেকে প্রকাশ

করার জন্য নয়, নিজেকে প্রদর্শন করার জন্য। আজ সন্ধ্যায় অমনি সেজেগুঁজে যখন বেলী রোডের এক বাড়িতে অনুষ্ঠিত সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পৌঁছে, জাফর তখন গেয়ে চলছিলো-'এ লড়াই বাঁচার লড়াই.....'।

রোজীর দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়েছিলো জাফর। রুবীকে দেখলো যেন এক নির্লজ্জ রূপ প্রকারের কদর্য ভূমিকায়। তাকে সাথে আসতে বার বার অনুরোধ জানিয়েছে জাফর, রাজি হয়নি। জাফরের ভ্রম-দৃষ্টি অবাক করলো নিজেকে অমন বেশভূষায় কি করে এতো লোকের মাঝে এলো রুবী?

স্থির দৃষ্টে তাকিয়েছিলো রোজী গায়কের দিকে। মোহাবিষ্ট সে দৃষ্টি-ব্যাখ্যার ঝামেলা গিয়ে পড়ে যত গরিব লেখকদের উপর। মনের না বলা আবেগে তাকিয়ে থাকে আধুনিকারা আর বেচারা লেখক সময় মাটি করে খুঁজে ফেরে তাদের মনের ভাব কেন অমনি তাকিয়েছিলো, কি ভেবেছিলো তারা তখন? গান গেয়েই অনুষ্ঠান থেকে চলে গিয়েছিলো, জাফর, রোজী তা দেখেছে। আবার ফিরবে-এরকম ভরসায় বসেছিলো যতক্ষণ না রুবী এলো।

অনুষ্ঠান শেষে বাসায় ফিরে রোজী দেখে তার বাবার হাতে মদের বোতল, বর্তমানে মন্ত্রীদের টেনশন মুক্তির মহৌষধ। আর অন্যদিকে বাসায় ফিরে রুবী দেখে মাথা ধরার অজুহাতে না খেয়েই সকাল সকাল রাতে শুয়ে
পড়েছে জাফর।

ব্যাপারটুকু বুঝতে দেরি হয়নি কবীর। এ রকম ভুল অনেকেই করে। জাফরকে কে বুঝাবে যে, রোজীকে রুবী ভেবে ভুল করেছে জাফর? জাফর
ভাবছিলো- সাধাসাধি করার পর যখন রাজি হলো না, তখন ঐ ঝাঁঝালো উগ্রতা নিয়ে ওরকম অনুষ্ঠানে কেনো গেলো সে, একবার জিজ্ঞেস করে কেবল। জিজ্ঞেস করলেই চুকেবুকে যেতো সব, কিন্তু কে করবে তা? জাফর করবে? কেনো, তার কি আত্মসম্মান নেই? কী করবে? কেনো, তার কি অভিমান নেই?

তৃতীয় অধ্যায়

জাফর একজন ব্যক্তি মাত্র, একজন মানুষ। এ সমাজেই তার বাস, জঙ্গলে নয়। মানুষ সামাজিক জীব, সমাজ মানুষেরই সৃষ্টি। জাফরকে বুঝতে হলে তাই সমাজকেও বুঝতে হবে। সমাজকে সৃষ্টি করে মানুষ আবার এই সমাজ দ্বারাই সে পরিচালিত হয়। তাই ব্যক্তি ও সমাজ অবিচ্ছেদ্য। কে জানে কত লক্ষ বা কোটি বছরের রক্ত ও ঘামের এই পিচ্ছিল পথ দিয়ে মানুষকে আজকের এই সভ্যতার দ্বারে পৌঁছতে হয়েছে।

মানবসভ্যতার উষালগ্নে মানুষ যখন গুহায়, জঙ্গলে বাস করতো, পারস্পরিক শোষণের ব্যাপারটি তখন ছিলো না। ছিলো না শাসন। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ছিলো সকলের অবাধ সমানাধিকার। সম্পদের প্রাচুর্য আর লোকসংখ্যার স্বল্পতার কারণে সমাজের কাঠামো দাঁড় করানোর প্রয়োজনীয়তাও ছিলো না সে আদি যুগে। বন্যপ্রাণী তথা প্রকৃতির বিরুদ্ধে এবং শিকারের জন্য ঐক্যবদ্ধ শক্তি প্রয়োগ ছাড়া শক্তি প্রয়োগের ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজন ছিলো না। সমাজ ছিলো না, ছিলো না সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানও। কয়েক লক্ষ বছর ধরে এরকম চলেছে। ধীরে ধীরে সংখ্যা বাড়লো মানুষের, সে সংখ্যা সম্পদের উপর ফেলতে শুরু করলো তার প্রভাব। খাদ্য আহরণের জন্য যখন মেহনতের প্রয়োজন দেখা দেয়, মানুষের আলস্য ভাঙার সে যুগে বিনা পরিশ্রমে বা কম আয়াসে খাদ্য আহরণের প্রবৃত্তি জেগে ওঠে কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে। বিচ্ছিন্নভাবে শুরু হয় ব্যক্তির দ্বারা ব্যক্তিকে ঠকানোর পালা। ঠকানোর সাথে ঠেকানোর বিষয়টির শুরুও তখনই। ব্যক্তি দ্বারা শোষণ এবং ব্যক্তি দ্বারা প্রতিরোধ-এভাবেই গায়ের জোরের প্রতিযোগিতার শুরু।

আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামোর ঐতিহাসিক ধারায় সমাজ এবং গোত্রের প্রভাব যথেষ্ট। সমাজ থেকে রাষ্ট্র, গোত্র থেকে সমাজ। ব্যক্তি দ্বারা ব্যক্তি শোষণের সে যুগে গোষ্ঠীবদ্ধতা আসতেও কম সময় লাগার কথা নয়।

অন্যায়ের প্রতিরোধ করা হচ্ছে মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামোর কথা বিবেচনা করলে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে বলা যায় রাষ্ট্র হচ্ছে একটি নেতিবাচক শক্তি। আধুনিক সেনাবাহিনী, পুলিশ এসবই নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকে। জনকল্যাণের জন্য রাষ্ট্র-একথা বিবেচনা করলেও দেখা যায় যে, অন্যায়ের প্রতিরোধ করতেই রাষ্ট্রশক্তি নিয়োজিত।

তাই স্পষ্টভাবেই বলা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলো সমাজের দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা। কেননা, ব্যক্তি দ্বারা ব্যক্তি শোষণের সে যুগে স্বাভাবিকভাবেই এরূপ ঘটেছিলো এক ব্যক্তি ক্রমে একাধিক ব্যক্তিকে শোষণ শুরু করে এবং তার প্রতিবাদও হয়। গোত্রে অবস্থিত একাধিক শোষণকারী তাদের কাজে বাধাগ্রস্ত হয়ে নিজেদের কাজ হাসিলের জন্য ব্যক্তি স্বার্থের সমন্বয় ঘটাতে ঐক্যবদ্ধ হয়। ঐক্যবদ্ধ দুষ্টগ্রহের প্রতিরোধে ভালো মানুষরাও ঐক্যবদ্ধ না হয়ে পারে না। একই

গোত্রে এভাবে দুটি সংঘ স্থাপিত হয় পরস্পরের বিরুদ্ধে। এই সংঘই সমাজের কাঠামো দাঁড় করায় পরবর্তীতে।

আদি যুগের বহু বছর পরের ঘটনা দাস যুগের। মালিকরা দাসদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাতো বলে দাসশ্রেণি বিদ্রোহ করেছিল মালিকদের বিরুদ্ধে, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলো। দাস যুগের পতনের পর এলো সামন্ত যুগ। এ যুগেই মানুষ ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তি স্থাপন করে এবং এখান থেকে শুরু হয় রীতিমত শোষণ। এ শোষণের মূলে আছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি। হাজার হাজার কৃষক কাজ করতো এক একজন ভূস্বামীর অধীনে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পতন ঘটে সামন্ততন্ত্রের, শুরু হয় ধনতান্ত্রিক যুগের। ভূ- স্বামীর স্থলে মালিক শ্রেণি হয়ে দাঁড়ালো শিল্পপতি। শ্রমিক শ্রেণিকে দিনরাত খাটিয়ে ধনী হতে লাগলো মুষ্টিমেয় মালিক শ্রেণি।

এখানেও দেখা দিলো বিদ্রোহ, শিল্পপতি মালিক শ্রেণির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শ্রমিক শ্রেণি সূচনা করলো নবযুগের সমাজতান্ত্রিক যুগের। এভাবেই প্রথমবারের মতো শোষিত শ্রেণি শোষকের হাত থেকে মুক্তি পেলো ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে। লেনিনের নেতৃত্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছে রাশিয়ায়।

শ্রেণি সংগ্রামের এ ধারাটির এতটুকু ইতিহাস জাফরের জানা আছে। শোষিত এবং শোষক শ্রেণি এ দুটি শ্রেণির মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম-এ সম্পর্কে অনেক বই রয়েছে যা না পড়লে শ্রেণি শোষণ ও শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস যে পুরাপুরি জানা যায় না জাফর তা ভালো ভাবেই জানে।

সেই আদি যুগ থেকে বর্তমানের সমাজতান্ত্রিক যুগ পর্যন্ত যে ক'টি যুগের ধাপ অতিক্রান্ত হয়েছে, সর্বত্র শোষকরাই শোষিতের উপর তাদের নিজেদের স্বার্থে জুলুম অত্যাচার চালিয়েছে, অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে টিকে থাকতে চেয়েছে। অন্যদিকে এই নির্যাতনের মাত্রা যতো বাড়ে, শোষিত শ্রেণির মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ততো হয় প্রবল। ক্রমে সে বিদ্রোহ মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে, পরিণতিতে সূচনা হয় নতুন একটি যুগের।

জাফর ভাবে-তবে এক একটি যুগের অবসানেই শোষণের পুরো সমাপ্তি কেন ঘটে না? চূড়ান্ত জবাব নিজের মন থেকে না পেলেও জাফর এটুকু বুঝে যে, প্রতিটি বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছে ধনিক শ্রেণির মধ্য থেকেই মানবতাবাদী কোনো মানুষ। যার ফলে সে নেতৃত্ব সর্বদাই থেকে গেছে ধনিক শ্রেণির হাতে। কিন্তু ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় ঘটেছে একটি নতুন ব্যাপার। সম্পন্ন পরিবারের লেনিন সম্পূর্ণরূপে শ্রেণিচ্যুত হতে পেরেছিলেন। আর একটি সম্পূর্ণ বিপ্লব করতে হলে খেটে খাওয়া সর্বহারা শ্রেণির একটি বিপ্লবী দলের প্রয়োজন, যা সম্ভব করেছিলেন রাশিয়ার লেনিন।

এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা ভাবে জফার। দীর্ঘ নয় মাসের এত বড় একটা রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ মুক্তি আনতে পারলো না বাংলাদেশের মানুষের জন্য। মুক্তি আসেনি, দুঃখ-কষ্টই শুধু বেড়েছে। পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছে যারা, তাদের শ্রেণি চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে আর আফসোস থাকে না

এই পরিণতি দেখে। গতকাল ঘুম থেকে উঠে মেঝেতে পড়ে থাকা দিনের পত্রিকাটি তুলে নিয়েছিলো জাফর। এক টাকার নোটের দুটি করে চারটি ছবি। প্রতি নোটের নম্বরই এক। নিচে বাংলাদেশ সরকারের অর্থসচিব কে. এ. জামান-এর স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। বাংলাদেশের টাকার নোট ছাপা হয় ভারতে। মুদ্রাস্ফীতির সমস্ত লক্ষণ এখন বাংলাদেশে। ব্যাপারটির একটি সহজ সরল উপসংহার টানতে দেখা যায় সর্বত্র।

যে যুদ্ধ মানুষের মুক্তি আনতে পারলো না, তাতে অংশ নিয়েছিলো সে- ভাবতেই রি রি করে ওঠে জাফরের গা-গতর। সে চেয়েছিলো দুর্ভাগা দেশকে শোষণের হাত থেকে মুক্ত করতে। সে তো চায়নি এদেশকে ভারতীয় শোষকদের হাতে তুলে দিতে, এক শ্রেণির মানুষকে ক্ষমতাসীন বানাতে। সে কেন, কোনো মুক্তিযোদ্ধাই চায়নি।

পর মুহূর্তে সমস্ত ইতিহাস চেতনাকে ছিন্নভিন্ন করে মাথাচাড়া দেয় জাফরের নিষ্কলুষ আবেগ। না, না, এর কিছুই ব্যর্থ হয়নি, গোটা জাতির এত বড় আত্মদান ব্যর্থ হতে পারে না। জাফর বুঝতে পেরেছে জাতীয় শোষকগোষ্ঠী ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাঙালি জাতির আত্মদানের ইতিহাসকে ম্লান করে দিতে চাইছে; জাতিকে জড়িয়ে নিতে চাইছে নতুন ধরনের এক শোষণ-জালে। নগ্ন আর এ ষড়যন্ত্রেই বাংলার মুক্তি সংগ্রামে সাহায্যের নামে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলো ভারতীয় সেনাবাহিনী। মুক্তি সংগ্রামের বিপ্লবী চেতনাকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে আওয়ামী শাসকগোষ্ঠী। সংগ্রামের নেতৃত্ব যেহেতু তাদের হাতে ছিলো, তারাই এখন সংগ্রামের সুফল উপভোগ করছে।

গত সংগ্রামের সময় জাফরের জানা ছিলো না কীভাবে শোষিত শ্রেণির সত্যিকারের মুক্তি আসে। তখন সে জাতীয় আবেগে অন্ধ, আজ তার চোখ খুলে গেছে। ধোঁকা খেয়েছে বলেই আজ আবার নতুন করে চিন্তা করতে শিখেছে সে। শুধু কি সে? না। গোটা বাংলাদেশের মানুষ আজ একই রকম ভাবছে।

ভাবতে পারার এই ক্ষমতা এসেছে মুক্তিসংগ্রামের চেতনা থেকে। শ্রেণি চেতনাই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সবচেয়ে বড় দান। এবার চাই সর্বহারা শ্রেণির জন্য একটি বিপ্লবী দল। বিপ্লবী দল, বিপ্লবী দল চাই। ক্রমে উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠলো জাফর।

তার চিৎকার শুনে ঘরের ভেতর থেকে রুবী তাড়াহুড়ো করে সামনে এসে দাঁড়ালো। তবু জাফর চিৎকার করে বলছে- হ্যাঁ হ্যাঁ, একটি বিপ্লবী দল চাই, সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী দল বুঝলে? এই বলেই জাফর চুপ করে ছোট্ট শিশুর মতো রুবীর দিকে চেয়ে রইলো, যেন তার বড্ড অপরাধ হয়ে গেছে। কিন্তু নির্বাক রুবী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বললো, জাফর ভাই, এতোক্ষণ কি চেয়েছিলেন?

জাফর তখনও যেন সম্পূর্ণ হুঁশে নেই। যে জাফর রুবীর সামনে কোনো কথাই বলে না সেদিনের সেই সন্ধ্যা থেকে, সেই জাফর রুবীকে সামনে দেখেও অস্ফুট স্বরে বলে চলেছে;

একটি বিপ্লবী দল চাই, বিপ্লবী দল, বুঝলে রুবী?

হ্যাঁ বুঝলাম। জাফরের মুখে অনেক দিন পর রুবী তার নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনে আবেগে একবার চোখ বুজে যেন বলতে চাইলো 'তোমার বিপ্লব সার্থক হোক, তবু তো বিপ্লবের নামে আমার নামটা তোমার মুখে উচ্চারিত হলো।'

রুবী মনে মনে গর্ব অনুভব করে এই ভেবে যে, জাফর এতো কঠিন চিন্তার মধ্যে রুবী নামটা ভুলেনি। এটুকুতেই রুবীর প্রতি জাফরের দুর্বলতা আজ আবার নতুন করে ধরা পড়ে। রুবীর মনে আজ দু'মাস পরে আবার গোপন আনন্দের ঢেউ বয়ে গেলো। জানতে পারলো, বুঝতে পারলো কেন এ দুটি মাস জাফর তার সঙ্গে কোনো কথা বলেনি। জাফর যে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সব সময় চিন্তায় মগ্ন থাকে এ দৃশ্য রুবী লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকবার দেখেছে। তার চিৎকারের মধ্যেই পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠলো আজ তা। জাফর যে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষকে শোষণ মুক্ত করতে চায় এ কথা জাফর তাকে মুখে না বললেও টেবিলের উপরে ছড়ানো কাগজপত্রে তার আভাস সে পেয়েছে। কিন্তু সেদিনের সেই সন্ধ্যার পর থেকে জাফর যে রুবীকে এড়িয়ে চলতো তা লক্ষ করে কম দুঃখ পায়নি রুবী। মুখ ফুটে প্রকাশ না করলেও একথা সত্যি যে, জাফরের প্রতি রুবীর অনুরাগ দিনের পর দিন বেড়েই চলছিলো। জাফরকে না দেখে এক মুহূর্তও যেন কাটতে চাইতো না রুবীর। অভিমান করে গত দুটি মাস জাফরের সঙ্গে কথা বলেনি সত্যি, কিন্তু এ দুটি মাসে গোপনে ভালোবাসার চারাটা যেন একটি বলিষ্ঠ বৃক্ষে পরিণত হয়ে গেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

শহরের ফুটপাতে বিনা উদ্দেশ্যে পায়চারী করতে নামলে দু'চোখ যেমন উন্মাদের মতো এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করতে থাকে, তেমনি মনটাও নানা জল্পনা-কল্পনার ভিড়ে হারিয়ে যেতে চায়। এ ধরনের উদ্দেশ্যবিহীন লোকদের ভাগ্যে মাঝে মধ্যে দু'একটা একসিডেন্ট ঘটে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু জাফরের ভাগ্যে তেমন কিছু ঘটলো না। দুর্ঘটনা ঘটা তেমন কিছু অস্বাভাবিক ছিলো না, কারণ সে শুধু উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় নেমে আসেনি, এর মূলে দুরন্ত আবেগও কাজ করেছে। আজ এমন একটি আবেগ তাকে কাবু করেছে যে আবেগকে সে কিছুতেই মনের কোণে স্থান দিতে চায় না। তবু সেই আবেগই তাকে ঘিরে ফেললো আজ? এ কথাটি চিন্তা করতে করতে দিশেহারার মতো রাস্তায় নামতে লাগলো জাফর। না, আর সে যাবে না রুবীদের বাসায়। কখনো যাবে না। অন্য কোথাও গিয়ে উঠবে। কিন্তু কোথায় যাবে সে? ঢাকায় আত্মীয় বলতে আর তো তেমন কেউই নেই জাফরের, তবে কোথায় যাবে সে? অন্য কোথাও লজিং থাকার চেষ্টা করবে? কিন্তু সেখানেও যদি 'রুবী ধরনের' কোন ঝামেলা থাকে, তাহলে? না, কাজ নেই তাতে। তার চেয়ে বরং ভার্সিটির কোন হলেই চলে যাবে, অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে, কারো সঙ্গে কাটিয়ে দেবে কয়েক মাস। তারপর দেখা যাবে। কিন্তু একি ভালো হবে? এমনি পালিয়ে যাওয়া যে কাপুরুষতার লক্ষণ। তাছাড়া রুবী যাই ভাবুক, ওর মা-বাবাই বা কি ভাববেন হঠাৎ এমনি উধাও হওয়াতে? তারা তো কম স্নেহ করেন না জাফরকে? নাহ তাদের ছেড়ে আসা ঠিক হবে না, এমন অকৃতজ্ঞতার কাজ জাফরের দ্বারা কোনোভাবেই করা সম্ভব নয়। এমনি চিন্তাভাবনার ধূম্রজাল ঠেলে ঠেলে পথ চলছিলো জাফর। হঠাৎ একটি পরিচিত গলা শুনতে পেলো- আরে জাফর যে! কোথায় যাচ্ছিস?

রাস্তার ওপারে তাকাতেই দেখতে পেলো-অত্যাধুনিক বেশভূষায় সজ্জিত একটি যুবক। চোখে কালো রঙের গগলস, মাথায় লম্বা চুল, স্বাস্থ্য বেশ থলথলে। চেহারা পরিচিত মনে হলেও প্রথমে কেমন যেনো খানিকটা খটকা লাগলো তাকে চিনতে। কিছুক্ষণ হাবার মতো চেয়ে রইলো জাফর। আরে অমন কইরা কি দেখছিস? দোস্তকে ভুইলা গেলি জাফর?

গলার স্বরে পথচারী এবার জাফরের কাছে ধরা পড়লো। তাছাড়া ওকে চেনার আর কোনো উপায়ই ছিলো না। সম্পূর্ণ বদলে গেছে যে, সে ছেলেটির নাম বাবুল। স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে জাফরের সঙ্গেই এম. এ. পড়তো। দু'জনেই সলিমুল্লাহ হলের একই রুমে থাকতো। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো দু'জন। জাফরের আর্থিক অবস্থা ছিলো মোটামুটি। বাড়ি থেকে প্রতি মাসে দুশো টাকা পেতো আর বড় ভাইয়ের কাছ থেকে পেতো দুশো। বড় ভাই জাবেদ পাকিস্তানি আমির ক্যাপ্টেন ছিলেন। চারশ' টাকা অবশ্য জাফরের প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তা থেকে বাবুলের খরচও চালাতো সে। বাবুল গরিবের ছেলে।

ছেঁড়া বা তালি দেয়া জামাকাপড় দিয়ে কোনো রকম কাটাতো। স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও ছিলো রোগাটে, আজকের মতো এমন থলথলে নয়। তখন ওরা গায়ের রঙই শুধু ফর্সা ছিলো, তবে এতো চমক ছিলো না। কথা বলতো খুবই কম। সেদিনকার সেই বিনয়ী বাবুল শুধুমাত্র দেড় বছরের ব্যবধানে এতো মোটাসোটা, স্মার্ট এবং চটকদার হয়ে উঠতে পারে-এ কথা জাফর যেনো কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলো না। তবে ওয়ে সেই বাবুল তাতে কোনো সন্দেহই রইলো না জাফরের। তবু এর রহস্য কোথায়? জাফর বেশ জোরেই বললো-বাবুল নাকি রে?

তা এতক্ষণে চিনলি? বলেই ছুটে এলো রাস্তা পেরিয়ে জাফরের কাছে। গুলিস্তানের মোড়ে দাঁড়িয়ে দুই বন্ধুর কোলাকুলি হলো আজ ঠিক সতেরো মাস পরে। সেই '৭১ সনের পঁচিশে মার্চের ভয়াল রাতে তারা এক সঙ্গেই হল থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো। পরে যার যার বাড়িতে চলে যায়। জাফর মুক্তি সংগ্রামে চলে যায় সেখান থেকে। বাবুলের কাহিনিটা এখনো জানা নেই জাফরের।

এখন ১৯৭২ সনের আগস্ট মাস চলছে। বেশ গরম পড়েছে আজ। বেলাও প্রায় তিনটে হয়ে গেছে। ম্যাটিনি শোর জন্য প্রচণ্ড ভিড় জমে আছে গুলিস্তান হলের সামনে। রাস্তায় পিঁপড়ের মতো মানুষ আর গাড়িঘোড়া ছুটছে। এদ্দিন কই ছিলি রে জাফর?

তুই কই ছিলি তাই বল না আগে? তোকে তো প্রথম চিনতেই পারিনি। এত্তো মোটাসোটা হয়েছিস?

চিরদিন কি আর মানুষ একরকম থাকে রে! বল দেখি একি হালত বানাইছিস তুই? ময়লা জামা, নোংরা পাজামা, ছেঁড়া স্যান্ডেল, চুল এলোমেলো? সন্ন্যাসী সাজলি-টাজলি নাকি?

বাবুলের ব্যাখ্যা শুনে জাফর নিজেকে নীরবে একবার পরীক্ষা করে দিশে ফিরালো এবং কেমন যেনো সঙ্কুচিত হলো মনে মনে। হবারই কথা, যে জাফর স্বাধীনতার আগে সব সময়ই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাকে নিজের স্বভাবের অঙ্গ মনে করতো আর সমালোচনা করতো অনেকের নোংরা পোশাকের, আজ তাকেই এ ধরনের সমালোচনার পাত্র হতে হলো। তা-ও আবার বাবুলের মতো ছেলের কাছে যাকে সে-ই সাজিয়ে পরিয়ে রাখতো? এ দশা হলো কেনো? এর জন্য দায়ী কে?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর খানিকটা হেসে জবাব দিলো আজকাল এসবের দিকে খেয়াল নেই রে বাবুল।

তুই বলছিস একথা জাফর! হলো কি তোর? আচ্ছা থাক ওকথা, এই রোদে এখন কোথায় যাচ্ছিলি?

কোথাও না, এমনিই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। মনটা আজ বিশেষ ভালো নেই। তুই কোথায় যাচ্ছিলি? আর এতো স্মার্ট কি করে হলি? এই বলে জাফর বাবুলের আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করতে থাকে।

সব কথাই বললো। আগে চল কোথাও গিয়ে বসি, সিনেমা অন্য দিন দেখবো। বলেই টিকিট ছিঁড়ে ফেলে একটা বেবী ট্যাক্সির প্রতি ডাক হাঁকলো বাবুল-এই বেবী।

বাবুলের হাতে ব্যালকনির টিকিটটা অমনিভাবে ছিঁড়তে দেখে জাফর বাধা দিয়ে বললো-আরে কি করছিস? তুই যা, সিনেমা দেখে আয়। পাঁচটা টাকার টিকিট অমনি ছিঁড়ে ফেললি।

'আরে, কি হয়েছে তাতে? টাকার আজকাল অভাব আছে নাকি রে! বলে জাফরের প্রতি তাকিয়ে খানিকটা হাসলো বাবুল।

বাবুলের মুখে "টাকার আজকাল অভাব আছে নাকি রে" কথাটি জাফরকে অবাক করে দেয়। এতো টাকা বাবুল কোথায় পেলো? ওকি তাহলে আজকাল। পকেট মারা শিখেছে, না ডাকাতি করে? না, তা-ই বা হবে কেনো? বাবুল তো কোনোদিন ঐ ধরনের ছেলেই ছিলো না। তাহলে এতো টাকার গর্ব কেনো?

কোত্থেকে এলো এতো সব? বলেই ফেললো জাফর।

আরে বলবো, সব বলবো। আগে চল না বসি গিয়ে কোথাও। এই যে বেবী এসে গেলো। নে ওঠ জাফু।

কোথায় যাবি?

কোথায় আর? ঢাকায় তো মাত্র দুএকটা জায়গাই আছে ভদ্রলোকের বসার মতো। হোটেল পূর্বাণী আর ইন্টারকন ছাড়া বাকি সব তো থার্ড ক্লাস লোকদের জন্য। তা ঐ চায়নিজ রেস্টুরেন্টেই চল।

এসব কি বলছিস? না বাবা, আমি যাবো না ওখানে, ওখানে যাবার দরকার কি? তারচেয়ে চল, হেঁটে হেঁটে সদরঘাট পর্যন্ত ঘুরে আসি।

হেঁটে হেঁটে ঘুরে আসি। যতোসব। এই রোদে হাঁটা যায় নাকি এক আর তাছাড়া স্বাধীনতার পর ওসব হাঁটাহাঁটির ধারে কাছেও নাই আমি। গাড়ি পড়ে রয়েছে গ্যারেজে আর একটা নিয়ে গেছে আব্বা তার জন্য ছেলের বাড়িতে, তাই তো আজ ট্যাক্সি করে বাইরে এলাম।

তোর নিজের গাড়িও আছে? বলে জাফর অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বাবুলের দিকে। শুধু গাড়ি কেনো দুটো বাড়িও আছে। আরো অনেক অনেক কিছু আছে, চল সব বলবো বলে এক রকম জোর করেই বেবী ট্যাক্সিতে জাফরকে বসিয়ে দেয়। চালককে বললো ইন্টারকনে যেতে।

বেবী ছুটলো। জাফর মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে থাকে। তার কাছে এসব যেনো স্বপ্নের মতোই মনে হয়। বাবুলের বাড়ির খবর জাফর ভালোভাবেই জানতো। কোন রকমে কষ্ট করে সংসার চালাতো তার বাবা। বাড়িতে একখানা টিনের ঘর ছিলো। তার ছাউনিটাও নাকি সম্পূর্ণ টিনের ছিলো না। ঢাকায় তো তাদের কোনো বাড়ি ছিলোই না। ভার্সিটি থেকে গুলিস্তানে আসতে হলে স্বাধীনতার আগে বাবুল হেঁটে আসার প্রস্তাব দিতো। তখন জাফরই রিকশা ভাড়া দিয়ে, কখনো কখনো দু'জনে এসে সিনেমা দেখে যেতো। বেবী কিংবা ট্যাক্সির কথা বাবুল তখন মুখে আনতেও সাহস পেতো

না। হলের একঘেঁয়ে খাবার খেয়ে খেয়ে মনটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো বলে বাবুল নিজেই জাফরকে প্রস্তাব দিতো মাঝে মধ্যে।

জাফু চল আজ কোথাও গিয়ে খাই।

বাবুলকে খুশি করার ইচ্ছা জাফরের সব সময়ই ছিলো, তাই দু'জন হাঁটতে হাঁটতে সদরঘাট পর্যন্ত এসে কোন হোটেলে পেটপুরে খেয়ে নিতো। কিন্তু স্বাধীনতার আট মাস পরে সেই বাবুল আজ এসব কি বলছে? তার নিজের একটি নয় দুটো গাড়ি আছে, ঢাকায়ই দুটো বাড়ি আছে। টাকার কোনো অভাব নেই। নোংরা হোটেলে সে যাবে না; ইন্টারকন, পূর্বাণী আর চায়নিজ রেস্টুরেন্ট ছাড়া ভদ্রলোকেরা নাকি বসে না। আরো অনেক অনেক কিছুর সঙ্গে এ কথার কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পেলো না জাফর। অনেক ভেবেও কিছু অনুমান করতে না পেরে, শেষে সিদ্ধান্ত নিলো হয়তো বা আলাউদ্দিনের চেরাগ পেয়েছে বাবুল। ওর সব কথা জানার জন্য জাফরের প্রবল ইচ্ছে জাগলো, বেবীতেই জিজ্ঞেস করলো তুই কি বিয়ে করেছিস?

বিয়ে করলে তুই জানবি না? আর কাউকে না হোক, তোকে তো কার্ড পাঠাতামই।

তাহলে....মানে....?

তাহলে আবার কি? তুই এখনও ভাবিস এতো টাকার গাড়ি, বাড়ি ও সামান্য সম্পত্তির মালিক আমি কি করে হলাম? চল না ইন্টারকনে পৌঁছে সবই বলবো তোকে।

এতো আশ্বাসের পরও জাফরের ঔৎসুক্যের অবসান ঘটলো না। তার মনে পড়লো লোকমুখে শোনা অনেক কথা, স্বাধীনতার পর পরই আওয়ামী লীগের নেতা, উপনেতা, পাতি-নেতা, হাফ-নেতা, টাউট কর্মীদের লুটের কাহিনি।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে এদেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আওয়ামী লীগ এখন যে নারকীয় কাণ্ডের সৃষ্টি করেছে তা সকলেরই জানা, সবার চোখের সামনেই বেহায়াদের মতো তারা লুট করেছে এদেশের সম্পত্তি। এ লুটের 'বিসমিল্লাহ' হয়েছিলো মিত্রবাহিনীর হাতেই। তাদের আনুষ্ঠানিক পর্বের পরে আওয়ামী লীগ শুরু করলো লুটপাট।

বিহারিদের গাড়ি, বাড়ি, দোকানপাট, টাকা-পয়সা সোনা-গয়না এবং তাদের যুবতী মেয়েদের ইজ্জত লুট থেকে শুরু করে মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, পি. ডি. পি এসব ভূতপূর্ব রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীদের বাড়িতেও তারা হিংস্র পশুর মতো ছোবল মারতে ছাড়েনি। যেখানে যা পেয়েছে জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছে। শুধু কি তাই? এ দেশের ধান, চাল, পাট এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারতে কেনাবেচার আসর জমিয়েছে।

আট মাসেই দলের ছিরি গেছে পাল্টে। এমন কি শিল্প এলাকা থেকে মূল্যবান পার্টস, মেশিন ইত্যাদি ভারতে পাচার করছে তারা মিত্রবাহিনীর সহযোগিতায়। ব্যাংকগুলো থেকে কোটি কোটি টাকা লুট করে ভারতসহ অন্যান্য বিদেশি ব্যাংকে জমা রেখেছে। ক'দিনেই দেশটাকে ছারখার করে দিয়েছে লুটের অসম্ভব লীলা চালিয়ে। সাধারণ মানুষের মুখ খোলার জো ছিলো না, কারণ তখন মিত্রবাহিনী, মুজিব বাহিনী, আওয়ামী

লীগ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, লাল বাহিনী এবং অন্যান্য বাহিনীর দাপটে কোনো মানুষ টু শব্দটি পর্যন্ত করতে পারেনি। কেউ বললে বরং তাকে রাজাকার, আলবদর বলে পিটিয়েই মেরে ফেলতো; নতুবা টুস করে গুলি। নিজেদের মধ্যে এসব লুটের মাল ভাগ করে দোষ চাপাতো পাকিস্তানি বাহিনীর উপর। জাফর এসব জানে, শুনেছে, দেখেছে আওয়ামী লীগের জঘন্য নাটক। ঘৃণায় জাফর আওয়ামী লীগকে যুদ্ধের পর থেকেই আর সমর্থন করতে পারেনি। দেশের প্রতি তাদের এহেন কু-মনোবৃত্তি দেখে, তাদের বেইমানি দেখে জাফর যুদ্ধের পরই বাড়ি চলে গেছে। একেবারে নির্বাক হয়ে। লজ্জা আর ঘৃণায় জড়োসড়ো হয়ে জাফর মনেক দিন ছিলো চুপচাপ। তবে সে ঘুমিয়ে নেই, দারুণ সজাগ সে, ভেতরে অনবরত আগুন জ্বলছে তার।

বেবী থেমে যেতেই জাফর সচেতন হলো। প্রথমে দু'তিনটি কথা ছাড়া বেবীর মধ্যে পাশাপাশি বসে থেকেও তাদের মাঝে আর কোনো কথা হয়নি। মাঝে মাঝে পরস্পরের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হেসেছে অবশ্য। বাবুলের হাসিতে ছিলো আনন্দের ছোঁয়াচ আর জাফরের হাসিতে ছিলো সন্দেহের জিজ্ঞাসা বেবীকে জাফর ভাড়াটা শোধ করার জন্য পকেটে হাত দিতেই বাবুল তার হাত খপ করে ধরে ফেলে, অন্য হাতে মানি ব্যাগ বের করলো। বাবুল ব্যাগের চেইন কটাস করে টেনে ১০ টাকার একটা নোট ড্রাইভারের সাঁটে ছুড়ে ফেলে বললো, চল জাফু ভেতরে।

কতো দিলি ওকে?

সবটাই।

সবটাই! ওর ভাড়া তিন টাকার বেশি নয়।

আরে থাক, খুচরা নেই। এই দ্যাখ না সবই তো ১০০ টাকার নোট-এই বলে মানি ব্যাগটা জাফরের চোখের সামনে তুলে ধরে। জাফর দেখে তো অবাক! ওর জীবনে এতোগুলো ১০০ টাকার নোট এক সঙ্গে কখনো দেখেনি।

সে চিৎকার করে বারবার বলতে চেয়েছিলো কোথায় পেলি এতো টাকা? কিন্তু সে কথা আর বলা হলো না। ড্রাইভারকে এতো টাকা দেওয়াতে জাফরের প্রচণ্ড আপত্তি, কারণ তারা কিছু সাহেবদের এমন বাড়তি পাওনা পেয়ে অন্যদের কাছেও দাবি করে বসে উপরি পাওনা। সীমিত আয়ের লোকেরা তো পারে না দু'টাকার জায়গায় দশ টাকার নোট ছুড়তে।

নেমেই জাফরের মনটা গেলো বিগড়ে। ভেতরে যাবার ইচ্ছেটা তার সম্পূর্ণভাবে উবে গেলো। অবশ্য তার কতোগুলো কারণও আছে। একেতো ওর যা বেশভুষা, এ নিয়ে অমন সুসজ্জিত হোটেলের মধ্যে খেলে তাকে বেমানান লাগবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়ত এর পকেট বলতে গেলে খালি, ভিতরে গেলে আপ্যায়নের সব ভার যে বাবুলকে নিতে হবে এতে তার আপত্তি। তাছাড়া বাবুলের টাকাগুলো ওর কাছে কেমন যেনো ঘৃণ্য জিনিস বলে বোধ হলো, মনে হলো ওগুলো কাউকে বঞ্চিত করে ছিনিয়ে আনা টাকা। বাবুলের হাত ধরে বললো সে।

দ্যাখ বাবুল আমি হোটেলের ভেতরে যাবো না।
সে কি রে? তা কি হয়?
আরে না, আজ অন্য কোনোদিন দেখা হবে আবার।
যত্তোসব বাজে কথা, চল দেখি, বলেই জাফরকে টানতে লাগলো হাত ধরে। জাফর আপত্তি জানিয়ে আবার বললো-এই শোন, এ ধরনের নোংরা পোশাক নিয়ে কীভাবেই বা ওখানে যাই বল?
আরে তাতে কি? অন্যদিন আবার সেজেগুঁজে আসা যাবে, আজ এভাবেই চল। বলেই টেনে নিয়ে গেলো জাফরকে।
জাফর আর প্রতিবাদ করতে পারে না। তাছাড়া সে নিজের মুখেই বাবুলের ঘটনাগুলো জানতে চায়।
হোটেলের দরজায় এগিয়ে যেতেই কয়েকবার 'হ্যালো'র আদান-প্রদান করেছে বাবুল। এখানকার সবাই যেনো ওর অতি পরিচিত। বেয়ারাগুলো সালাম করলো নত হয়ে। ওরা দু'জন সোজা গিয়ে বসলো 'বার রুমে'। জাফরের অনুমানই ঠিক, ইতোমধ্যেই অনেক জোড়া চোখ ওকে ঘিরে বেশ কৌতুকে মেতে উঠেছে। বাবুল পকেট থেকে ডানহিলের প্যাকেট এবং দামি লাইটার টেবিলের ওপর রেখে জাফরকে বললো, নে সিগারেট খা।
আমি ওগুলো খাইনে। আমার ব্রান্ড স্টার। জাফর নিজের প্যাকেটটা বের করলে বাবুল ডানহিলের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলে, আরে রাখ তো তোর স্টার, আজ তুই আমার গেস্ট তাই আমার ইচ্ছেমতো চলতে হবে তোকে।
জাফর কথা না বাড়িয়ে বন্ধুর প্যাকেট থেকে সিগারেট নেয়। বাবুল এবারে ফস্ করে তার দামি লাইটার দিয়ে সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করতে করতে বলে, আচ্ছা বল, কি খাবি?
একগাল ধুয়া ছেড়ে জাফর উত্তর দিলো- আরে, এখানে খেতে এসেছি নাকি? তুই বল, হঠাৎ করে তোর অবস্থার এমন পরিবর্তন ঘটলো কীভাবে? ধৈর্য হারাসনে, বলছি। শোন্ লাঞ্চ খাবি নাকি?

না। খেয়েই বেরিয়েছি আমি।
তবে চল একটা করে বীয়ার খাই।
বীয়ার! ওসব তো আমি কোনোদিনই খাইনি।
তা আমি জানি, তা আজ না হয় একটু খেলি আমার সঙ্গে; কি হবে তাতে? মজা লাগবে, নেশা লাগবে দোস্ত; খা না একটা।
পাগল হয়েছিস নাকি? আমি খাবো না, তুই খা, কিন্তু কবে থেকে শুরু করলি এসব?
আমার সোনার বাংলা মুক্ত হওয়ার পর থেকেই। ওটা না খেলে কি আর এমন গোলগাল হতে পারতাম ভেবেছিস? ওয়েটার! এই ওয়েটার, দুটো বীয়ার প্লিজ।

দূর থেকে ওয়েটার অর্ডার লিখে নিয়ে যায়। পরক্ষণেই দুটো বীয়ার আর দুটো গ্লাস নিয়ে আসে। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর জাফর বলে-হ্যাঁ তাইতো ভাবছিলাম, তোর রোগা দেহটা এতো ফুলে গেলো কি করে?

আরে দোস্ত বীয়ার তো বীয়ার, ব্র্যান্ডি, জিন, স্যাম্পেন, এসব খেয়েছি। রোজ রাতেই তো প্রায় পাঁচশো টাকা লাগে ওর পিছনেই।

পাঁচশো। কোথায় পাস্ এতো টাকা?

ওহ, শোনো ছেলের কথা, এটুকু শুনেই ভয় পেলি? শোন, শোন, তোর কাছে আর কি লুকাবো, লক্ষ্মী দেশটির মুক্তির পরেই হাতে একটা আলাউদ্দিনের চেরাগ পেলাম, বুঝলি। যখন যা চাই, তা-ই পাই।

তোর কথার কিছুই বুঝি না। আচ্ছা সব শুনবো তুই আগে বীয়ার খেয়ে নে, আর আমার জন্য এক কাপ চা কিংবা ঠান্ডা জাতীয় কিছুর অর্ডার দে

আচ্ছা তুই যখন খাবি না, বলতে বলতে বাবুল নিজের গ্লাসটা ভরে নেয়। ওয়েটারকে চা আর কিছু স্ন্যাক্সট নিয়ে আসতে বলে। বীয়ারের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে মুখ তুলে সে।

ভার্সিটিতে পড়ে এতোদিনে কিছুই শিখলি না। দ্যাখ, তুইতো ন'টি মাস কষ্ট করে যুদ্ধ করেছিস, কিন্তু কি পেলি তুই? আর আমি? যুদ্ধের ধারে কাছেও যাইনি, দেশ মুক্ত হওয়ার পর পরই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে দেখা করলাম। ঘণ্টা খানেক আলাপ করার পরে মোহাম্মদপুরের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান হিসেবে নিযুক্তি পেলাম। তারপর আর কে পায় আমাকে? ওখানেই বিহারীদের প্রকাণ্ড দুটো বাড়ি দখল করে নেই। ওদেরই ফেলে যাওয়া দুটো নতুন টয়োটা নিজের আয়ত্তে আনি। ওদের বাড়ির দামি দামি আসবাবপত্র বিক্রি করে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তো দু'এক লাখ টাকা হাতে এসে গেলো। তারপর বিহারিদেরই পরিত্যক্ত দুটি হোটেলের মালিকানা নিলাম। আরো ছোটখাটো অনেক কিছু পেয়েছি, বুঝলি। বলেই একটানে বীয়ারের গ্লাস খালি করে, আবার পূর্ণ করলো গ্লাস।

আচ্ছা তারপর? জাফর প্রশ্ন না করে পারলো না।

তারপরে তো কয়েকটা লাইসেন্স নিয়ে নিলাম। বাপ-দাদার চৌদ্দ পুরুষে যেসব ব্যবসার লাইন জানতাম না, সেসব ব্যবসার লাইসেন্স নিলাম। নেবো না। কোনো, চাওয়া মাত্রই তো পেয়ে যাই। আরে শোন্ সবচে' মজার কথা হলো, তুই তো জানিস, আমি তাঁতি নই বা আমার সে ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান নেই। তবু কাগজে কলমে দেখালাম আমার হাতে বিশখানা তাঁত আছে সিরাজগঞ্জে, ব্যাস! অমনি সুতার লাইসেন্সটা পেয়ে যাই। মন্ত্রী সাহেব চেকটেক কিছুই করলো না। সোনার বাংলার সব লক্ষ্মী মন্ত্রী বুঝলি? সুতা বেঁচে বেঁচে টাকা রাখার আর জায়গা পেলাম না, তাইতো এসব খেয়ে বেড়াচ্ছি বলেই আবার মারলো চুমুক বীয়ারের গ্লাসে।

আচ্ছা তোর আলাউদ্দিনের জাদুই চেরাগের কথা তো বললি না দোস্ত। ওহ! আচ্ছা! এই বিংশ শতাব্দীর আলাউদ্দিনের জাদুই চেরাগ হলো 'মুজিব বাদ', বুঝলি 'মুজিব

বাদ'। ওটা হাতে নিবি তো একদম মালদার হবি। যা চাইবি তাই পাবি, রাতারাতি রাজাও হতে পারবি। যদি বলিস আমি অমুকের গাড়িটা চাই। বাস্! অমনিই ওটা তোকে দেয়া হবে; যদি বলিস অমুক দালানটা চাই, তৎক্ষণাৎ ওটা তোর; এমন কি যদি বলিস অমুকের কন্যা বা সুন্দরী বউটা চাই সেও তোরই হবে, মুহূর্তের মধ্যে। যদি মনে করিস অমুককে গুলি করে এখনই শেষ করতে হবে। বাস! স্টেনগানটা নিয়ে গিয়ে তার বাসার মধ্যেই গুলি করে আয়, কোন ঝামেলা হবে না। সাধে কি আর বলছি যাদুই চোরাগ!

আরে হ্যাঁ। তুই আজকাল কি করছিস জাফু?

কিছুই না।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইতো তোর চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে। শোন আমার মতো হতে চাস?

কীভাবে? জাফর অবাক হয়!

বারে, অতি সোজা। কালই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অফিসে এসে যা, মুজিববাদী খাতায় নাম লিখিয়ে যা রাতারাতি নরক থেকে স্বর্গে। তুই কালই আসবি বুঝলি? আর হ্যাঁ, ও কথাটাতো নিশ্চয়ই শুনেছিস, আমাদের ছাত্রলীগ ভেঙে দু'ভাগ হয়েছে-মুজিববাদী আমরা আর বৈজ্ঞানিকবাদী নাকি অন্য গ্রুপ। তাই নাকি? আমি তো বাড়ি ছিলাম এসব কিছুই জানি না। তাছাড়া বাড়ির অবস্থা আজকাল খারাপ, তাই ওসব ছেড়ে দিয়েছি।

ভালো করেছো, এখন বাঁচতে হলে মুজিববাদ করো। এখানে রাজনীতি জানো আর না জানো, জ্ঞান থাকুক আর নাই থাকুক কিছুই আসে যায় না। নাম একবার লেখালেই ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়। 'মুজিববাদ ধন্য হোক' বলেই একটানে গ্লাস খালি করে আবার বীয়ারের অর্ডার দিলো বাবুল।

আরো খাবি নাকি?

আরে দু'চার বোতলে হয় নাকি? তুই সত্যি দুনিয়া সম্বন্ধে কিছুই খবর রাখিস না। আমাদের মদ টানার স্টেমিনা কি কারো চেয়ে কম মনে করিস? এই তো প্রতিদিন সন্ধ্যায় এখানেই প্রায় শ' থেকে দুশো মুজিববাদী ছেলেরা ছিটফটি হয়ে আসে আর শুরু হয় কমপিটিশন। তবে তোর আশীর্বাদে আমি কারো চেয়ে পিছিয়ে নেই এ ব্যাপারে বুঝলি? জয় লক্ষ্মী 'মুজিববাদ' বলে দিলো আরেক চুমুক।

জাফর দেখলো বাবুলের চোখ দুটো লাল টকটকে হয়ে উঠছে। এদিকে বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে। বাবুলের কাছ থেকে যা জানার ছিলো তা জেনে নিয়েছে সে। বাবুলকে জানতেও দেয়নি, সে মুজিববাদকে চরমভাবে ঘৃণা করে আর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রেরই একজন সাধক সে। জুন মাসে পল্টনে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের সম্মেলনে রব-সিরাজের গ্রুপেরই সে একজন বিশিষ্ট নেতা জাফর ভাবছে, এখন বাবুলের কাছ থেকে বিদায়

নেওয়া যায় কীভাবে? বললো- শোন বাবুল, আমিতো ভুলেই গেছি ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আমার একটা এনগেজমেন্ট আছে সেখানে আমাকে যেতেই হবে।

বিদায় চাস? কিন্তু তুই তো কিছুই খেলি না। আরেকটু দেরি করে ডিনারটা খেয়ে যা দোস্ত।

'না আবার অন্য দিন দেখা হলে খাবো। আচ্ছা তুই একটু বস, আমি টয়লেট থেকে আসি। বীয়ার খেলে মুততে মুততে আমার জান যায়। বাবুল জাফরকে একা রেখে টলতে টলতে উঠে গেলো।

জাফরের সামনে অর্ধেক গ্লাস বীয়ার এবং তার পাশেই একটা পূর্ণ বোতল ঠিক এমন পরিবেশে তাকে এখানে রুবী দেখলে কি ভাবতে পারে এটা চিন্তা করতে করতে দরজার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে জাফর।

দরজা ঠেলে যে মেয়েটি ঢুকলো সে যে সত্যিই রুবী। সেই কুৎসিত ডঙে কাপড় পরা, চুল বাঁধা; অধরে লিপস্টিকের রেখা স্পষ্ট। হাতে ভ্যানিটি হাত, তার পিছনেই ঢুকলো অতি আধুনিক কায়দায় সজ্জিত একটি যুবক।

বাবুলের বর্ণনা সে যুবককে মুজিববাদী ভাবতে প্রেরণা জোগায়। কিন্তু রুবী ওর সঙ্গে কি করে এলো? আর কেনই বা এখানে? ছিঃ ছিঃ এতো জঘন্য, এতো নীচ যে কয়েক ঘণ্টা আগেও জাফরের সামনে বুক ভরা দুঃখ নিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে দাঁড়িয়েছিলো! জাফরের কল্পনার শেষ না হতেই দু'জন আগন্তুক তার সামনের টেবিলে আসন নিলো। মেয়েটি চেয়ার টেনে বসতে দিয়েই জাফরের দিকে চোখ ফেরালো। সে চিনে ফেলেছে জাফরকে। এই তো সেই সুদর্শন যুবক যাকে রোজী গত দু'মাস ধরে কল্পনা আর স্বপ্নের মাঝেই চেয়েছে। এই তো সেই বিপ্লবী গায়ক যার কণ্ঠে রোজী খুঁজে পেয়েছে নবজীবন-নবসুর। না, রোজীর ভুল কিছুতেই হয়নি এই-ই সেদিনকার হিরো যাকে রোজী শহরের বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে বেড়িয়েছে, কোনো সন্ধান পায়নি। রোজী জাফরের দিকে চেয়ে রইলো সেদিনের মতোই এক দৃষ্টিতে আত্মহারার মতো।

জাফরও তার পানে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে। তার বুকে ঝড় বইতে লাগলো, কিন্তু এ ঝড় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের-এ ঝড় ছিলো হিংসার, ঈর্ষার, এ ঝড় ছিলো ক্রোধের অভিমানের। জাফর চোখ নামায়নি একটিবার, কারণ সে চাইছিলো রুবী দেখে নিক জাফর আজ মদ খাচ্ছে দেখে নিক রুবী প্রাণভরে। কি আসে যায় তাতে জাফরের? জাফর কি রুবীকে ভয় করে?

বাবুলের অপেক্ষা না করে হঠাৎ জাফর উঠে গেলো। দরজা খুলে হনহনিয়ে বেরিয়ে পড়লো। রোজী কিছুই বুঝতে পারলো না কেনোই বা এ লোকটি তাকে এড়িয়ে গেলো। কেনোই বা সে তার দিকে এতো প্রখর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো? আবার কেনোই বা বিদ্যুতের মতো চলে গেলো। সেদিন সন্ধ্যায়ও তো এমনিভাবে সে গান গেয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিলো আবার আজও দৃষ্টি মেলাতেই উঠে গেলো। কেনো? তার উত্তর আজ রোজীকে পেতেই হবে। রোজীর সাথের যুবকটি এসেই টয়লেটে গেছে, সে উঠে

জাফরের পিছু পিছু ছুটলো। এতোক্ষণে জাফর হোটেল থেকে বের হয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে। বেবী ঠিক করে তাতে উঠতে যাবার সময় মেয়েলি কণ্ঠের আওয়াজ শুনলো সে প্লিজ শুনুন!

জাফর ঘাড় ফিরিয়ে ঘৃণার সুরেই বললো, আর কি বলতে চাও! আর কি-ই বা বলার বাকি রইলো? চোখের সামনেই তো দেখলাম-চলো বেবী,

চালাও।

এবারে একেবারে কাছে ছুটে এলো রোজী। অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলো-কাকে কি বলছেন? আমার কথা তো শুনুন?

কথা! কথা!! রাখো তোমার ন্যাকামি। চলো বেবী। বলতেই ড্রাইভার চালিয়ে দিল বেবী। ফুটপাতে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো রোজী।

পঞ্চম অধ্যায়

হোটেল ইন্টারকন থেকে বেবী হাঁকিয়ে জাফর চললো নয়া রাজধানীর দিকে। সে আজ কোথাও পালাতে চাইছে-শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে অন্য কোথাও। যেখানে তার পরিচিত কেউ থাকবে না, যেখানে তাকে নাম ধরে কেউ ডেকে হোটেল ইন্টারকনে নিয়ে যাবে না। ইন্টারকনের দুটি ঘণ্টার কথা ভাবলে তার যেনো শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। দুটি ঘণ্টা যেনো সে নরকে জ্বলে পুড়ে এলো।

হ্যাঁ, আজ সে পালাবে! কিন্তু কেনো পালাবে? কার ভয়ে পালাবে? রুবীর ভয়ে? তা সে কখনো করবে না। তাহলে এই সমাজের ভয়ে? বাবুলের মতো সুবিধাবাদীদের ভয়ে? বর্তমান সরকারের শোষণ, জুলুম আর অত্যাচারের ভয়ে? পালালেই কি সামাজিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? পাওয়া যায় কি শান্তি? পালিয়ে বা এসবের কাছে আত্মসমর্পণ করলে আপাতত গা বাঁচানো যায়, কিন্তু শান্তি কখনো পাওয়া যায় না। বাবুলকে আর তার বন্ধু ভাবতে পারে না জাফর। ওর মতো পিশাচ সুবিধাবাদীরা কখনো তার বন্ধু হতে পারে না। সত্যিকারের বন্ধু কি কখনো শোষকের কাছে সামান্য সুবিধা অর্জনের জন্য আত্মসমর্পণ করতে উপদেশ দেয়। ওর মতো রাতারাতি ধনী হতে হলে নাকি মুজিববাদে নাম লেখাতে হবে। অমন বন্ধুত্বকে সে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিতে পারে না। যে সম্পদ অন্যকে বঞ্চিত করে, লুট করে আনতে হয়, তেমন উপার্জনকে জাফর ঘৃণা করে। হ্যাঁ, সব মুজিববাদীরা আজ তাই করেছে। স্বাধীনতার পর কি একটা আজব 'বাদের সৃষ্টি করে তারই আড়ালে দেশটাকে লুটপাট করে শ্মশানে পরিণত করেছে ওরা। মুজিববাদকে বলছে বিংশ শতাব্দীর আলাউদ্দিনের যাদুর চেরাগ। এ যাদু বিদ্যায় অবিশ্বাস করা যায় না, তা না হলে অমনি আঙুল ফুলে কলাগাছ কীভাবে হলো বাবুল? না, জাফর কোথাও পালাবে না। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আবার নতুন করে সংগ্রাম করবে। সংগ্রাম- সংগ্রামই একমাত্র পথ। এমনি চিন্তার জালকে ছিন্ন করে জাফর বেবীকে বললো-

শেরে বাংলা হাসপাতাল চেনো?

হ্যাঁ সাব, মিরপুর রোডে পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের এটা না? হ্যাঁ, ওখানে চলো। কিন্তু তুমি কি করে চিনলে?

চিনুম না ক্যান সাব, রোজই তো একবার যাইতে হয় ঐ হানে।

কেনো যাও?

যাই কি আর সাথে সাব? একটাই ছেইলা ছিলো, মুক্তিযুদ্ধে গিয়া অহনে ঠ্যাং দুইটা হারাইয়া পঙ্গু অইয়া পইড়া রইছে।

তোমার আর কোন ছেলে-পিলে নেই?

না সাব। আর কেউ নাইকা। জোয়ান হেইলা আমার, ও-ই এই টেক্সি চালাইতো। এহন তো পেটের দায়ে নিজেই চালাইতেছি। কি করমু সাথ, বাঁচতে তো অইবো। এই বলে গামছা দিয়ে ঘাম না চোখের জল মুছলো জাফর তা দেখতে পেলো না। তবে পিছনে

বসে বসে সে অনুভব করতে পেরেছিলো যে, ছেলের কথা মুখে আনতেই বুড়ো লোকটির গলার আওয়াজ কেঁপে উঠেছিলো। উঠবেই তো একটি মাত্র ছেলে যে বুড়োকে উপার্জন করে খাওয়াতো সে আজ অচল পা দুটো হারিয়ে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে। আর এই বুড়ো বয়সে তাকে বেবী ট্যাক্সি চালাতে হচ্ছে। তার সক্ষম ছেলে বেঁচে থেকেও আজ মৃতপ্রায়। দুঃখটা কি কম? বুড়োর কংকালসার চেহারা, পরনে ছেঁড়া লুঙ্গি ও জামা, মুখে দাড়ি, চোখে হতাশা সর্বোপরি তার পঙ্গু ছেলেটির কথা শুনে জাফর কিছুক্ষণের জন্যে তার নিজের সব কথাই ভুলে গেলো। বুড়োকে সান্ত্বনা দেবার মতো কোনো কথা খুঁজে পেলো না চেষ্টা করলো না। কারণ সে জানে এ ধরনের সান্ত্বনা বুড়োর কোনো উপকার তো করবেই না বরং তার মন আরো দুর্বল হয়ে যাবে। তাই সে অন্য কথা জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু এবারে আর তুমি সম্বোধনে নয়।

চাচা, সরকারি সাহায্য পেয়েছেন?

সরকারি সাহায্য কথা মুখেই আইনেন না সাব। সব ধোঁকাবাজ। বেইমান? কাদের সরকার। সরকার আছে নাকি এ দেশে সাব? বিচার নাই। আচার নাই, কথার দাম নাইকা।

কেনো কি হলো?

অইবো আর কি, সাব। কইছিলো দুই হাজার কইরা ট্যাহা দিবো। আজতক এটা কড়িও দিলো না। সব ট্যাহা বড় লোকের ছেইলা-পেইলারা পাইছে, তাদের ঠাংও জোড়া লাগছে। কিন্তু শরীরের কিছু অইলো না সাব কোনোদিন আইবোও না-আমরা গরিব সব সময় গরিবই থাইকা যামু।

আরে না, চাচা হবে, হবে। একদিন হবেই। সেদিন আর বেশি দূরে নয়।

আর ঐ কথা কইয়েন না সাব। অনেক কথা শুইনা আইলাম। শেখ মুজিবও তো কইছিলো ক্ষমতায় যাইতে পারলে এ দেশে গরিব থাকবো না। বি অইলো? যারা দেশের জন্যে যুদ্ধ করলো আইজ তারাই পঙ্গু অইয়া পইড়া রইছে। কেউ খোঁজও লয় না। শেখ মুজিবকে আমরা আগেও চিনতাম কিন্তু কি আর কইমু সাব, অইছি গরিব।

জাফর বুড়োর কথার উত্তর দিতে পারে না। বুড়ো শেখ মুজিব সম্বন্ধে কি বলতে চাইলো? শেখ মুজিবকে আমরা আগেও চিনতাম এ কথায় বুড়ো কি বোঝাতে চাচ্ছে জাফরকে? তাহলে কি শেখ মুজিবের এমন কোনো কাজ তার মনে আজো জেগে আছে, যা দিয়ে বুড়ো তাকে অতি সহজে মাপতে পারছে? তরুণরা শেখ মুজিবকে ভালো করে না চিনলেও বড়োরা তো আর ভুলেনি? তারা তো তাঁর আসল চেহারা অনেক আগেই দেখেছে যখন তিনি পাকিস্তানের দুর্নীতি দমন মন্ত্রী ছিলেন।

ইতোমধ্যে বেবী ট্যাক্সি শেরে বাংলা হাসপাতালের সামনে এসে থেমেছে। বেলা তখন সাড়ে পাঁচটা। জাফর বুড়োকে ভাড়াটা ঢুকিয়ে দিতে দিতে বললো-

চাচা চলুন না আপনার ছেলেকে দেখে আসবেন?

না সাব, অহন না। রোজ রাইতেই একবার দেহা করি।
ছেলের নামটা বলুন, আমি দেখা করবো।
আর কি দেখবেন সাব, ফজলের দুইটা ঠ্যাংই তো নাই, বলে বেবী ঘুরিয়ে যাওয়ার জন্য স্টার্ট দিলো বুড়ো। জাফর হাসপাতালে পা বাড়াবার আগে বলে গেলো-
চাচা বেশি চিন্তা করবেন না। একদিন ভালো দিন আসবেই।
আল্লায় দেহাইব না সাব, বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বেবী নিয়ে চলে গেলো বুড়ো। জাফর চলন্ত বেবীটা গেটের মোড়ে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত সেদিকে চেয়ে থাকে। পরে আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে এখানে কয়েকবার এসেছে। পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে দেখা করেছে। তার কোনো আহত বন্ধু নেই এখানে তবু ঐ পঙ্গুর দল ওকে বার বার টেনে নিয়ে আসে। কি যেনো এক সম্মোহনী শক্তি আছে ওদের মধ্যে। জাতি ওদের ভুলেই গেছে। ওরাই একদিন এই জাতিকে হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করার জন্যে মেতে উঠেছে, যুদ্ধ করেছে। কেউ দিয়েছে পা, কেউ হাত, কেউ হাত পা চক্ষু সব হারিয়েছে; কিন্তু স্বাধীনতার মাত্র আট মাস পরেই তারা আজ পড়ে রয়েছে হাসপাতালে সাথিহারা, সঙ্গহারা, সেবাহীন, অর্থহীন, নিতান্ত উপেক্ষিত।
এ জাতির ক'টা সবল লোক ওদের খবর নেয়? আর একদিন এই জাতিকে মুক্ত করার জন্যে ওরাই উন্মাদ হয়েছিলো। মুক্ত জাতি হিসেবে সব সুস্থ ব্যক্তিরা আজ আমোদ-আহ্লাদে মশগুল। ভুলেও একবার ওদের দেখতে যায় না। এ জাতির কাছ থেকে ওদের কি কিছুই প্রাপ্য নেই? সরকার না হয় ওদের উপেক্ষা করছে, ভুলে গেছে কিন্তু শহরের সুস্থ ও সবল জনসাধারণ ওদের দেখতে আসে না কেন? ঢাকা মিউজিয়াম, কাপ্তাই লেক, হোটেল ইন্টারকমে তো জন্তু সমাজের আনাগোনার অন্ত নেই? এই পঙ্গুদের এসে দেখে গেলে কি হয়? ওরা কি ঢাকা মিউজিয়ামের জড়বস্তুগুলোর চেয়েও মূল্যহীন? স্কুল-কলেজের ছাত্ররা পিকনিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে অনেক টাকা-পয়সা উড়িয়ে দেয়, মাঝে মাঝে স্কুল কলেজ থেকে প্রোগ্রাম করে এসে ওদের সাথে কিছু সময় কাটালে কি এমন ক্ষতিটাই হয় তাদের? অনেকেরই তো আত্মীয়-স্বজন ঢাকা এসে ওদের খোঁজখবর নিতে পারে না। এ হাসপাতালটি তবু ভালো। বিদেশিদের সাহায্যে পরিচালিত, এখানে সেবা কিংবা ঔষধপত্র মোটামুটি ভালোই মেলে। কিন্তু কতোশত পঙ্গু এখনো উপেক্ষিত পড়ে রয়েছে যেখানে সেখানে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। গাঁ- গ্রামের পঙ্গুরা তো শহর পর্যন্ত এসে পৌঁছতেও পারেনি। তাদের খোঁজ নেয়ার কেউ নেই। যারা একটু সচ্ছল তারাই কিছুটা চিকিৎসা পাচ্ছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজে বিনা চিকিৎসায়, বিনা যত্নে পড়ে আছে অনেকে। জাফর সেখানেও গিয়েছে, দেখেছে তাদের অবস্থা। আজ থেকে মাসখানেক আগে জাফর সেখানে গিয়েছিলো। অনেকেই চিনতো জাফরকে। গিয়েই বীভৎস একটা দৃশ্য দেখলো। প্রায় জন পঞ্চাশেক পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা একটি ব্যারাকে অবস্থান করছে। কেউ শায়িত, কেউ অর্ধশায়িত, কেউ বসে, কেউবা লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করছে; কারো দুটো

পা-ই নেই, বালিশ উঁচু করে পা দুটো কোনো রকমে রাখা, কারো দুটো হাতই নেই-বাহুর সামান্য অংশ বের হয়ে আছে, কারো সারা চোখমুখ পোড়া, বীভৎস চেহারা নিয়ে বিছানায় বসে আছে; কারো পুড়ে গেছে পিঠ।

সবাই তরুণ। ষোলো থেকে বিশ বছরের মধ্যে বয়স। প্রথম দিন এদের দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলো জাফর। যুদ্ধে সে অনেক মৃত্যু দেখেছে, বন্ধুর মৃতদেহ কাঁধে টেনেছে। তখন অনুভূতিই ছিলো না। এদের অবস্থা দেখে সেদিন জাফরের গা কাঁটা দিয়ে উঠেছিলো, মন কেঁদে উঠেছিলো। রীতিমত ভয়ও পেয়েছিলো। ওদের বুকফাটা আর্তনাদ ও অসহ্য যন্ত্রণা জাফরকে তুলেছিলো বিচলিত করে। একটা পোড়া মুখ দেখে সে আঁতকে উঠেছিলো। সেদিন নীরবে দেখেছে, কোনো কথা বলতে পারেনি।

আজ শেরে বাংলা হাসপাতালের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে সেদিনের সেই করুণ মুখগুলো ওর চোখে ভেসে উঠছিলো। উপরে উঠে এলেই সব মুক্তিযোদ্ধারা ওকে দেখে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো-

জাফর ভাই এই দু'মাস কোথায় ছিলে? এখন কেনো এসেছো? খালি হাতে কেনো এসেছো? একটা স্টেনগান নিয়ে এসে আমাদের ব্রাশ মেরে শেষ করে যাও, একটা গ্রেনেড এনে উড়িয়ে দাও আমাদের! কতোগুলো মাইন এনে আমাদের ভস্মীভূত করে দিয়ে যাও। আর সহ্য হচ্ছে না জ্বালা।

হঠাৎ উত্তেজিত ব্যবহার দেখে সিঁড়ির গোড়াতে থমকে গেলো জাফর। সে আজ কি দেখছে? সেই শান্ত অসুস্থ মানুষগুলো আজ হঠাৎ এভাবে ক্ষেপে উঠলো কেনো? কার উপরে তাদের রাগ, কার উপরে এতো অভিমান? জাফরের কি-ই বা অপরাধ? নাকি সকলের উপরেই ওদের রাগ, গোটা জাতির উপরেই ওদের আজ অভিমান! জাফর তো শুধু মুখের সান্ত্বনাই নিয়ে আসে, আর তো কিছুই করতে পারে না। ওদের উড়ে যাওয়া, কাটা হাত, পা ও মুখগুলোকে তো জোড়া দিতে পারে না? ওদের জ্বালা হচ্ছে, অনবরত যন্ত্রণা হচ্ছে। আত্মীয়-স্বজনহীন বিছানার উপরে একা একা দিনের পর দিন মাসের পর মাস বসে বসে ওদের যে বিরক্তি ধরে গেছে। ওরা ভালো খাবার বা ফলমূল পায় না-ওদের কোনো ভিজিটরস্ নেই। দু'জন নার্স শুধু সেবায় লিপ্ত, তারাও বিদেশি। যদিও তারা প্রাণপণে কাজ করে যাচ্ছে, তবু একসঙ্গে সবার আবদার তো আর মেটাতে পারছে না। আর তাই তো ওদের জ্বালা যন্ত্রণা বেড়েই যাচ্ছে। এসব ভাবনা কয়েক মুহূর্ত তাকে থমকে রাখলো, কিন্তু আজ তার চোখে পানি এলো না। ওদের প্রতিবাদের পর সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো সে

সাথিরা, প্রাণের বন্ধুরা আমার, আর আসবো না তোমাদের কাছে। কক্ষনো না। আমি এ শোষকগোষ্ঠীর রক্ত নেবো, প্রতিশোধ নেবো ওদের খতম করবো। হ্যাঁ, আমি আবার অস্ত্র ধরবো, সংগ্রাম করবো, তোমাদের মুখে হাসি ফোটাবো। তার জ্বলন্ত দুটি চোখ নিষ্পলক রেখে ধীরে ধীরে, হলটির ভেতরে ঢুকে এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত মূকের মতো পায়চারী করে স্তব্ধ হয়ে দু'সারি বেডের মাঝখানে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বললো-

সাথিরা, তোমাদের কসম করে বলছি, এই হাতে আবার অস্ত্র ধরবো তোমাদের আশা পূরণ করবোই করবো বলে চলছিলো সে। কিন্তু হঠাৎ কয়েকজনের মিলিত আওয়াজে থেমে গেলো।

জাফর ভাই, তাহলে তুমি আমাদের উপর আজ রাগ করলে?

জাফর ওদের দিকে চেয়ে দেখলো সবার চোখে অশ্রু। ওদের নিষ্প্রাপ দেশপ্রেমিক মুখগুলোর প্রতি কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে স্নেহময় কণ্ঠে বললো,-

পাগল, তোমাদের মতো ভালো মানুষদের উপর কি রাগ করা চলে? তোমাদের উপেক্ষা করে আজ যারা নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে ব্যস্ত, তারা মানুষ না। তোমাদের দাবি আদায়ের জন্যই আবার সংগ্রাম করবো এই আমার পণ-এ দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমায় আর এখানে দেখবে না। তোমরা আমরা সকলেই তো চেয়েছিলাম এদেশের শোষিত মানুষের সত্যিকারের মুক্তি, কিন্তু আজও তাদের মুক্তি আসেনি বলে আবারো সংগ্রাম চলবে।

জাফর তাই আমরাও করবো এ সংগ্রাম। এক পা, এক হাত নিয়ে সংগ্রাম করবো, অন্ধত্ব নিয়েও সংগ্রাম করবো। হাত-পা না থাকে না থাক রোলারের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে সংগ্রাম করবো। এই পঙ্গু, উপেক্ষিত জীবন নিয়ে আমরা আর বেঁচে থাকতে চাই না, চাই না আমরা কোনো দেশের দাসত্ব। জাফর ভাই, আমাদেরও নিয়ে চলো, বলতে বলতে সকলেই উত্তেজিত হয়ে বিছানায় বসে পড়লো।

ইতোমধ্যেই অপারেশন রুম থেকে বিদেশি ডক্টর, নার্স ছুটে এসে সবাইকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো। জাফরকে তাড়াতাড়ি এ জায়গা ছেড়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালো। যাওয়ার সময় জাফর সকলের প্রতি হাত উঠিয়ে শুধু বললো- চললুম সাথিরা। বিপ্লবী লাল সালাম।

উত্তেজিত অবস্থায় জাফর হেঁটে হেঁটে শেরে বাংলা হাসপাতালের গেট পেরিয়ে মীরপুর রোডে এসে গুলিস্তানের রিকশা নেয়। মনে নানা ধরনের জল্পনা কল্পনা নিয়ে আত্মভোলার রিকশায় হেলান দিয়ে বসে থাকে।

বেলা এখন ছটা। কেবল সূর্যাস্ত গেলো। রাজধানীর বুকে লাইটগুলো এখনো ঝলমলিয়ে ওঠেনি। নীল আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে কবুতর ডানা মেলে বেড়াচ্ছে, হয়তো খুঁজছে তাদের ঠিকানা, চারদিকে বাস, ট্রাক, ট্যাক্সির হর্নগুলো বেজে বেজে হারিয়ে যাচ্ছে দূরে।

জাফরের নিজেকে কয়েক যুগের ক্লান্ত পথিক মনে হলো। যেনো এতো যুগ শুধু হেঁটে হেঁটে চলার পর আজ একটা যান ব্যবস্থা পেয়েছে। চোখ দুটো আধবোজা অবস্থায় রেখে মনটাকে একবার গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করলো। পারলো না। আজ পুরো দিনটাই কেটেছে অভূতপূর্ব যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। সে ভাবতে থাকে কোথায় যাবে?

রিকশাটা ধীরে ধীরে গুলিস্তানের কাছে এসে থামলো। গুলিস্তান সিনেমার দরজায় দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো কি করা যায়? কোনো শান্তির জায়গায় গিয়ে বিশ্রাম নিতে

পারলে হয়তো তার মন কিছুটা আরাম পেতো। কিন্তু শান্তির জায়গা পাবে কোথায়? তাছাড়া শান্তির জায়গায় থেকেও তো অনেকে শান্তিতে নেই। সংগ্রামের মধ্যে থাকলেই শান্তির ঘ্রাণ পাওয়া যায়, শান্তিতে থেকে নয়। জাফর শান্তি চায় না, সংগ্রামই তার শান্তি, সে যে সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা নিয়েই সাথিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। বাসায় আজ রাত করে ফিরবে সে, যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে। সিনেমার পোস্টারের দিকে নজর যেতেই দেখতে পেলো একটা যুদ্ধের ছবি চলছে, শো এখনও শুরু হয়নি। জাফর সিনেমা দেখাই ঠিক করলো। যুদ্ধ দেখে যদি তার মনটা একটু শান্ত হয় তাতে ক্ষতি কি? হোক না সে যুদ্ধ পর্দায়, তবু তো যুদ্ধের কাহিনি। সেকেন্ড ক্লাসের একটা টিকেট কিনে জাফর ঢুকে পড়লো হলের ভেতরে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ছবিটা পুরাপুরি উপভোগ করার আগেই জাফর হল থেকে বেরিয়ে এলো। মন নিজের আয়ত্তে না থাকলে কি আর ছবি দেখা যায়?

হাঁটতে হাঁটতে সদরঘাট পৌঁছে গেলো। রাত প্রায় নটার মতো। এখনো ভিড় বুড়িগঙ্গার তীরে। লঞ্চ এসেছে টারমিনালে। এখানে কি এলাহি কাণ্ড! দুধের বাচ্চা থেকে একশো বছরের বুড়ো নারী-পুরুষ জটলা পাকিয়ে টারমিনালের সিমেন্ট করা ফ্লোরে শোবার জায়গা করে নিয়েছে। কারো বা ঘড়ঘড় করে নাক ডাকছে। শত শত বাস্তুহারার দল-ছিন্নমূল পরিবার। মেঘনা ও পদ্মার ছোবলে সব হারিয়ে মাথা গোঁজার জন্য এসেছে শহরে। ধানমন্ডি, গুলশান কিংবা ঢাকার নওয়াব বাড়িতে তো আর ওদের জায়গা হবে না, তাই বোধহয় ওরা সঠিক জায়গা বেছে নিয়েছে। কিন্তু এ লোকগুলো কি চিরদিনই এমনি করে পথের ধুলায় দিন কাটিয়ে যাবে? পাকিস্তান আমলে এতো ভিড় ছিলো না। দেশটা স্বাধীন হওয়ার পর পরই এদের মতো সহস্র ছিন্নমূল ভেসে বেড়াচ্ছে রাজধানীর পথে পথে, অঘোরে ঘুমোচ্ছে রেল স্টেশনে, লঞ্চ টারমিনালে, রেললাইনের ব্রিজের উপরে, ফুটপাতে, যেনো এখানে এরাই সত্যিকারের স্বাধীনতা পেয়েছে।

কিন্তু এই কি স্বাধীনতার আত্মপ্রকাশ না জীবনের প্রতি ধিক্কার আর অনীহার বহিঃপ্রকাশ? এদের জীবনের সব চাওয়া পাওয়া কি মিটে গেছে, না এদের দাবি দাওয়া শোনার মতো কোনো লোক বা প্রতিষ্ঠানই নেই? কতোকাল কাটবে এমনি করে পথে-প্রান্তরে আর টারমিনালে? সরকারের কি কোনোই দায়িত্ব নেই এদের প্রতি? এরা কি দেশের জনসাধারণ নয়? সুখ শান্তিতো দূরে থাক, এদের কি একটু আশ্রয়স্থলও মিলতে পারে না এ স্বাধীন বাংলাদেশে?

কেনো? কেনোই বা মিলবে না? এদেশের প্রতি যেমন তাদের পূর্ণ দাবি রয়ে গেছে তেমনি রয়েছে সরকারের দায়িত্ব এদের প্রতি। আজ হয়তো এরা এদের দাবি-দাওয়া বা অধিকার সম্বন্ধে সচেতন নয় বলেই ঘুমিয়ে রয়েছে ধুলোয়, এখানে সেখানে। এমনিই ছিলো একদিন রাশিয়ার শোষিত জনগণ, চীনের জনগণ, ভিয়েতনামের জনগণ, কিউবার জনগণ, কোরিয়ার জনগণ। কিন্তু যেদিন তাদের ঘুম ভেঙেছে, যেদিন তারা তাদের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হয়েছে সেদিন কি হয়েছে এসব দেশগুলোতে। সেখানে রক্তক্ষয়ী বিপ্লব, শোষিতের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম হয়েছে শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে এবং সেসব যুদ্ধে শোষকরা শুধু পরাজিতই হয়নি- চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেছে। এ ঘুমন্ত মানুষগুলো জাগলে এদেশেও তো তেমনি হওয়ার একান্ত সম্ভাবনা। সম্ভাবনা নয় এটা হবেই। এ ঘুমন্ত মানুষগুলোকে আজ রাতের আঁধারে শক্তিহীন মনে হলেও প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চিত রয়েছে এদের মাঝে-এদের চোখের ঘুম যে বিপ্লবেরই লক্ষণ। এদের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে থেকে জাফর মনে মনে উচ্চারণ করলো-পথে-প্রান্তরে, টারমিনালে, স্টেশনে এসব ঘুমন্ত মানুষগুলোকে জাগাতে হবেই। এসব

অচেতন দেহগুলোকে সচেতন করে তুলতেই হবে। এদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। এরা কেউ অবহেলার বস্তু নয়। ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী আর গণভবনে শায়িত মানবদেহগুলোর মতোই এদের দেহগুলো রক্তে মাংসে গড়া। প্রাসাদে শায়িত মানবগোষ্ঠীর স্বপ্নগুলো রঙিন হতে পারে, কিন্তু এদের প্রাণের স্বপ্নগুলোর রঙ না থাকলেও স্বপ্ন তো আছে। এদের প্রাণেও রয়েছে মায়া-মমতা, সাধ আর ভালোবাসা। নিষ্ঠুর পদ্মা, মেঘনা, যমুনা এদের জায়গা-জমি, ঘরবাড়ি কেড়ে নিয়েছে কিন্তু সমাজের বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কি পারে না তাদের আশ্রয় দিতে?

পদ্মা, মেঘনা, যমুনার নিষ্ঠুরতার চেয়েও কি মানবগোষ্ঠী আজ হিংস্র হয়ে গেলো? যদি তাই হয়, তবে সংগ্রাম আর বিপ্লবের মধ্য দিয়েই হোক এর মীমাংসা।

জাফরকে এতোক্ষণ এক বুড়ো অনুসরণ করছিলো। তাকে ওভাবে ঘুমন্ত লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বুড়োর কেমন যেনো সন্দেহ জেগেছিলো। একটু কেশে জিজ্ঞেস করলো সে।

ও সাব কি দ্যাহেন?

না এমনিই। বুড়োর দিকে তাকিয়ে বললো জাফর।

তামশা দ্যাখছেন বুঝি? দ্যাহেন, দ্যাহেন মাইয়া ছেইলাগুলান তো ন্যাংডাই শুইয়া রইছে। দ্যাহেন, মজা কইরা দ্যাহেন। শেখ সাহেবের রাজত্বে তো কাপড়েও আগুন লাগছে।

জাফর নির্বাক। বুড়োর উপর রাগ করার চেয়ে নিজের আচরণ বিশ্লেষণ করে দেখলো যে তার নিজেরই অন্যায় হয়েছে। রাতের বেলায় এমনি করে তাকিয়ে থাকা উচিত হয়নি। তাই লজ্জিত হয়েই বললো জাফর।

বাবা, আপনি ভুল বুঝেছেন। আমি অন্য চিন্তা করছিলাম।

ভুল বুঝমু ক্যান সাহেব। রোজ রাইডেই তো আপনাদের লোকেরা আইয়া এহান থেইকা জোয়ান মাইয়াগুলা রাইতের লাইগা লইয়া যায়। সবই তো চোহে দেহি, কইতেই খালি পারি না। অইছি গরিব, কি কমু সাব। ছয় মাস ধইরা এইহানে বইয়া এই কাণ্ডডাই দেখতাছি। আপনে ভালো অইতে পারেন-হলেই তো আছে তালে।

কথাগুলোর মানে জাফরের বুঝতে দেরি হয় না। এগুলো যে নিছক মিথ্যে যা বুড়োর প্রলাপ তা-ও নয়। এ ধরনের কথা জাফর আগেও শুনেছে, তবে এতো তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করেনি। স্বাধীনতার পর পরই কিছু নব্য ধনীর সৃষ্টি হওয়াতে পথে-ঘাটে তাদের টাকার বাহাদুরি চলছে-এ কথা বাংলার প্রতিটি মানুষই জানে। টারমিনাল বা স্টেশন থেকে গরিব মেয়ে ধরে নেওয়া তো কিছুই না তাদের কাছে। গায়ের জোর দিয়ে তারা এর চেয়েও দুঃসাহসিক কাজ করছে। মদের নেশায় বুঁদ হয়ে খেয়ালখুশি মতো রাস্তা থেকে কোনো মেয়েকে জোর করে ছিনতাই, কারো মেয়েকে ঘর থেকে ছিনতাই করা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। এসব কথা জেনেশুনেই জাফর বুড়োর কথায়

কোনো প্রতিবাদ করতে পারলো না। ভাবলো, এখান থেকে তার চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু তবু কিসের যেনো আকর্ষণে সে পা উঠাতে পারলো না। জাফর বুড়োকে বলে- ধরুন সিগারেট খান, বলে একটি সিগারেট দেয়।

আপনি?

আমি আরেকটা জ্বালিয়ে নিচ্ছি। বলেই জ্বলন্ত সিগারেট থেকে ধরিয়ে নিলো আরেকটি। সিগারেট হাতে নিয়ে বুড়ো খুশি মনে লম্বা টান দিলো, যেন অনেককাল পরে তার একটি সাধ মিটছে।

টারমিনালে লোকজন তখনও যাওয়া আসা করছে, তবে ভিড়টা কম। কাছে কোন লাইট ছিলো না। রাস্তা আর দোকানগুলোর আলোতেই মোটামুটি টারমিনালের ভেতরটা আলোকিত। জাফর জিজ্ঞেস করে-

কতোদিন হলো আছেন এখানে?

কইলামই তো ছয় মাস ধইরা।

এখানে কেনো থাকেন আপনার বাড়িঘর কোথায়?

বাড়িঘর! আমগো আবার বাড়িঘর? সব মেঘনা ধুইয়া লইয়া গেছে। বলেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে বুড়ো।

সরকারি কোনো সাহায্য পান না?

ধুর! আমগো কপাল তো পুড়ছেই, সরকারেরও কপাল পুড়ছে। এই ছয়ডা মাস এইহানে পইরা রইছি, কেউ আইয়া জিগাইলো না। মনে করছিলাম স্বাধীন দেশে একটু সুহে থাকমু, তা আরো কপাল পুড়ছে।

রিলিফের তো অনেক টিন দিয়েছে-টিন পাননি?

পাইলে কি আর এহানে থাকতাম? হিজলা থানায় কতো টিন গ্যালো, কোনো গরিব লোক একটাও টিন পাইলো না। এম সি গো মসজিপ, কাচারী ঘর, বাড়ি, বেড়া, পুকুরের ঘাট-এসব কর্ম্মেই সব লাগাইছে। আর কিছু কিছু তাগো নিজের লোকেরে দিছে।

এখানে কি একাই আছেন?

নাহ্, এইতো শুইয়া আছে জাবেদার মা, জাবেদা, দুইডা নাতি। আর আছি আমি। ছেইলাডা রিকশা চালায়।

এটাই সলিমুদ্দি বুড়োর গোটা সংসার। মেঘনা তার যৌবনে গড়া সংসারটি ভয়াল ছোবলে ছিনিয়ে নিয়েছে আজ থেকে বছর খানেক আগে। কিছুদিন গ্রামে এর-ওর কাছে ভিক্ষে করে খেয়েছে। কতোদিন আর ভিক্ষে করে চলে? ভিক্ষে চাইতে গেলে সবাই বলে কাজ করে খেতে পার না? কিন্তু সলিমুদ্দি কি কাজ করবে? ক্ষেতে হাল-চাষ করা ছাড়া তো কোনো কাজই শেখেনি। সারা জীবনের পরিশ্রমে কেনা কিছু জমি ছিলো তা-ও মেঘনা গিলেছে। পরের ক্ষেতে সব সময় কাজ পাওয়া যায় না।

দুই বাপ-বেটা পরের ক্ষেতে বেগার দিয়ে কোনো রকম পেট চালাতো। কিন্তু স্বাধীনতার পরে মাথার উপর পড়লো আরেক বোঝা। মেয়ে জাবেদার স্বামী রাজাকারে নাম

দিয়েছিলো, তাই তাকে স্বাধীনতার পরেই লোকে পিটিয়ে মেরেছে। তারপর থেকে জাবেদা বানু তার দুটি নাবালক ছেলে নিয়ে বাপের ভিটায় আশ্রয় নেয়। গ্রামে উপায় না দেখে একদিন পাড়ি জমালো ঢাকার পথে। ভেবেছে-শহরে হয়তো অনেক কাজ, যে কোনো কাজ জোগাড় করে তারা বাঁচবে। কিন্তু ঢাকা এসে কাজ না পেয়ে, আবার ভিক্ষে শুরু করেছে। অনেক কষ্টের পর একদিন এ আশ্রয়টি খোঁজে পেলো তারা। এখানে এসে জাবেদার দুই ফুটফুটে ছেলেও ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করেছে। তারা যাত্রীদের কাছে হাত বাড়ালে কিছু না কিছু পায়ই। জাবেদা আর তার মা বাসায় কাজ নিয়েছে, দিনে কাজ করে আর রাতে টারমিনালে থাকে। সলিমুদ্দি নিজেও ঘাটের কুলির খাতায় নাম লিখিয়েছে মাস দুই হলো। সবাই মিলে যা আয় করে তা দিয়ে কোনো রকম পেট চালিয়ে নিচ্ছে, এর বেশি যেনো করার কিছুই নেই। দেশের বাড়িতে ফেরার ইচ্ছে নেই যদিও, তবু প্রতি রাতে সলিমুদ্দি নিজের বাড়ির কথা মনে করে ছোট্ট শিশুর মতো কাঁদে। কিন্তু তার কান্নার কোনো দাম নেই এ কঠিন সমাজে। কেউ জানে না তার ব্যথা, সে বাড়ি ফিরতে চায়, ঘর বাঁধতে চায়, আবার পুত্র পরিজন নিয়ে আনন্দে কাটাতে চায় এসব কথা শুনতে শুনতে জাফর তার নিজের কথা ভুলে যায়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে রাত এগারোটা বেজেছে? জাফর বুড়োকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু ভাঙা মনে শুধু সান্ত্বনার কোনো দামই নেই। তার দরকার বাস্তব সাহায্য- তার প্রয়োজন আশ্রয়, প্রয়োজন তার হারিয়ে যাওয়া সংসার, ভিটেমাটি।

বিদায় নিয়ে জাফর সদরঘাটে বুড়ীগঙ্গার কিনারে হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালো। কতকগুলো নৌকো। মিটি মিটি বাতি জ্বলছে, কোনটা বা অন্ধকার, কেউবা আপন মনে ভাওয়ালি গাইছে, কেউ মুর্শিদী। এরা জাতে বেদে। কে জানে কোন জন্মে গৃহহারা হয়েছে এরা। এরা তো আর চিরদিন নৌকোয় নৌকোয় সংসার করেনি। নিশ্চয়ই তাদেরও আমাদের মতো ঘর সংসার ছিলো। হয় তো বা পদ্মা, মেঘনা, যমুনার ছোবলে গেছে, না হয় কোন কুখ্যাত শোষকের যাঁতাকলে পিষে গেছে। তারা হারিয়ে ফেলেছে জীবনযাত্রার পদ্ধতি। আজ স্থল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এরা। তাদের জন্ম-মৃত্যু বিয়ে, সবকিছু নৌকাতেই হয়। তারা সামাজিক রীতিনীতির ধার ধারে না। তাদের চলাফেরার উপর সরকারের কোনোই নিয়ন্ত্রণ নেই তারা যেনো এদেশের মানুষ না, সরকার যেনো এদের জন্য দায়ী নয়। এমনি ভাসমান চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। তাদের কে মরলো, কে জন্মালো তারও কোনো হদিস নেই। বাসার দিকে ফিরে গেলো জাফর। হ্যাঁ, আজ অনেক হয়েছে। ভেবেছিলো সারাদিনের ঘটনায় হয়তো মনটা তার ক্লান্তিতে ভরে যাবে, কিন্তু আদতে তা হয়নি, বরং উদ্দীপনা এসেছে। শোষিত জনতার করুণ দৃশ্যই তো বিপ্লবীদের জীবনে প্রেরণার উৎসস্থল।

সপ্তম অধ্যায়

ছ'মাস পরের কথা।

জাফর ঢাকা শহর ছেড়ে একদিন চলে এলো পলাশপুরে, গ্রামের বাড়িতে। কে জানে কোন সাহসে এ গ্রামটি ঠাঁই করে নিয়েছিলো রাক্ষুসী মেঘনার কূলে। অর্ধেক চলে গেছে নদী গর্ভে, পলাশ নামটি তবু অম্লান। মেঘনা আর পলাশের সহঅবস্থান চলছে আজও। পলাশকে অর্ধেকটা গিলে ধরেছে মেঘনা, তবু আবার ফিরিয়ে দেবার মনোভাব দেখা দিচ্ছে তার। জাফরদের বাড়ির সামনে একটা ধারা কাটায় চর জেগেছে আধো আধো। ক্ষতিপূরণ দেওয়াই প্রকৃতির স্বভাব। মানুষ তার উল্টো, গ্রাস করার মধ্যেই তার তৃপ্তি। বরিশাল জেলার হিজলা থানার অন্তর্ভুক্ত এই গ্রাম। এ গ্রামে শিক্ষিতের সংখ্যা তেমন বেশি নয়, যারা শিক্ষিত তারা চাকরি করে দেশে-বিদেশে এক সময় গ্রামটি ছিলো বেশ বর্ধিষ্ণু, সবার ঘরেই চাল, ডাল, পুকুরে মাছ, ক্ষেতে তরিতরকারি, গরুর দুধ, ঘি, দই এসবই ছিলো পর্যাপ্ত। পাকিস্তান আমলটাও মন্দ যায়নি, গ্রামে কৃষক আর তাঁতির সংখ্যাই ছিলো বেশি। স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাসে ক্ষতি হয়েছে যথেষ্ট। পাকিস্তানি সৈন্যরা গান বোট থেকে গোলাগুলি করে জ্বালিয়ে দিয়েছে গোটা বাজার, সারি সারি নারকেল আর সুপারির শোভনীয় বাগান। বাজারের সব ক'টি দোকানেই আগুন দিয়েছিলো, দোকানিরা পোড়া টিন দিয়ে কোনো রকমে ছাপরা বেঁধেছে পরে। পোড়া নারকেল আর সুপারি গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে পাকিস্তানী সৈন্যদের বর্বরতার জলজ্যান্ত সাক্ষী হয়ে। যেন বলতে চাইছে চিৎকার করে তোমাদের কাছে কিছু নেই চাইবার, শুধু ফিরিয়ে দাও আমাদের সজীবতা।

নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে পোড়া বাগানটির দিকে তাকিয়েছিলো জাফর। চোখের সামনে ভাসছিলো বাগানটির সজীব অবস্থা। ছিলো শত শত নারকেল আর সুপারি গাছের সমারোহ। সবুজ আর সবুজ। ঝড়ো হাওয়া এলে এই বাগানটি গ্রামের সবাইকে সর্বপ্রথম হুঁশিয়ার করে দিতো। গাছের পাতাগুলো সশব্দে জানাতো ঝড়ের পূর্বাভাস। প্রবল বাতাসকে সাহস ভরে প্রথম বাধা দিতো এই বাগানটিই। অন্য সময় বন-ঘুঘুদের পাখার ঝাপটা আর ঘুঘুর ডাকে মন- মাতাল করে তুলতো ক্ষুদে শিকারিদের। কতোবার জাফর এখানে এলে দিয়ে ঘুঘু শিকার করেছে। এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাফিয়ে বেড়িয়েছে সারা দুপুর। এই বাগানটিই তাকে পাঠশালার মাস্টারের মার থেকে বাঁচিয়েছে। মাস্টার তাড়া করলেই কোনো একটি নারকেল কিংবা সুপারি গাছের মাথায় আশ্রয় নিতো সে। গাছের মাথাগুলো ঠাকুরদার স্নেহভরা কাঁধের মতোই মনে হতো তার। একটু নুয়ে দেখলে সারি সারি গাছগুলোকে মনে হতো যেনো পেরেডে দাঁড়ানো একটি সুশৃঙ্খল আর্মি ব্রিগেড। ছোটবেলা কতোবার সে এমনি নুয়ে নুয়ে দেখেছে, আর মনে মনে বলেছে, 'এই আমার আর্মি ব্রিগেড। জাফরের নিরস্ত্র সেই আর্মি ব্রিগেডকে অন্য একটি আর্মি বাহিনী এসে হামলা চালিয়ে নাস্তানাবুদ করে দিয়ে গেছে।

আজ উপরে আর নিচে নুয়ে দেখছে না জাফর, সমতলে দাঁড়িয়ে উপরের দিকেই তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে। যেন নীরবে শুনে যাচ্ছে ওদের না বলা ব্যথা আর কাহিনি কি নির্মমভাবে দুর্ধর্ষ গানবোটগুলো আগুনের ফুলকি ছড়িয়েছে ওদের নরম নরম পাতার উপরে। কীভাবে ওদের সজীব চামড়া পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আর কি কাতর কণ্ঠে তখন ওরা নির্দোষ শিশুদের মতো চিৎকার করেছে-কেউ ছুটে আসেনি, জাফরও না।

হ্যাঁ এটা সত্যি, জাফর সেদিন ছুটে আসতে পারেনি ওদের সাহায্যে। জাফর ভারতে ছিলো এবং অস্ত্র নিয়ে যখন দেশে ফিরেছিলো তার আগেই ওদের জ্বালিয়ে দিয়েছে বর্বর পাকবাহিনী। জাফরের মনটা যেনো ভাবাপ্লুত হয়ে উঠলো। সে যেনো দেখলো এখানে বড় বড় ফোস্কা নিয়ে আহত অবস্থায় কোনো রকমে দাঁড়িয়ে আছে তার শৈশবের প্রিয় গাছগুলো। দাঁতে দাঁত রেখে নিঃশ্বাস ফেলে জাফর শুধু উচ্চারণ করলো-নিষ্ঠুর পাকবাহিনী।

তারপর নদীর কিনার ঘেঁষে পাশের ক্ষেতগুলো আর মেঘনার জলরাশির দিকে চেয়ে আনমনে হাঁটতে থাকে যেনো মনের গভীরে মেপে চলেছে জমিগুলোর সীমা। বুঝে ফেলেছে আগামী বর্ষায় হয়তো জমিগুলোকে আর টিকিয়ে রাখা যাবে না।

এমন সময় নদীর বুকে একজন মাঝি গেয়ে উঠলো-'নদীর একূল ভাঙ্গে, ওকূল গড়ে এইতো নদীর খেলা....।' কথাটা সত্যি। জাফরের মনে খটকা লাগে। সে ভাবছে তাহলে এক সমাজ ভাঙলে অন্য সমাজ গড়ে না কেনো? নিশ্চয়ই গড়বে। বর্তমানের পুরানো, অকেজো সমাজকে ভেঙে নতুন সমাজ গড়তেই হবে। হাঁটতে হাঁটতে কিছুদূরে গিয়ে দাঁড়ালো কয়েকটি নৌকা মাঝিদের কাছে। এটাই মাঝিদের ঘাট। স্বাধীনতার আগে এখানে আট দশখানা নৌকো থাকতো। বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে নৌকো বেয়ে জীবিকা অর্জন করতো এরা। কিন্তু স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যে এখানে আজ বিশ- পঁচিশখানা নৌকো দেখে জাফর অবাক হয়ে গেলো। প্রায় সব মাঝিগুলো পলাশ গ্রামেরই তাই জাফরকে চিনতো সবাই। এক সঙ্গে সবাই বলে ওঠে- জাফর সাইব কবে আইলেন? ভালো আছেন তো?

হ্যাঁ ভালো আছি। আপনারা কেমন আছেন?

আর কেমন থাকমু বাবা-বুড়ো মাঝি জবাব দিলো। বাকি সবাই চুপ করে নৌকোর গলুইয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

চাচা আপনি কবে থেকে নৌকো চালানো শুরু করলেন? আগে তো কখনো দেখিনি?

আগে কেমনে দেখবা, বাবা। এই কাম চৌদ্দ পুরুষেও তো করে নাই। পেটের জ্বালায় এহন করতাছি। কি আর করমু-হাতে যা ছিল সবই গ্যালো যুদ্ধের সময়। বড় পোলাডাও মইরা গ্যালো।

জমিজমার কি হলো চাচা?

বন্ধক দিছি, গরু দুইডা ব্যারাম অইয়া শেষ অইলো। হাতে টাকা কড়ি কিছু নাই। কি দিয়া হাল চালামু কও?

জাফর উত্তর দিতে পারে না। বুড়ো মাঝির প্রশ্নের উত্তর তার কাছে নেই। এ প্রশ্ন কঠিন, এ প্রশ্ন সত্য, বাস্তব। এর জবাব শুধু কথা দিয়ে দেয়া যায় না। আর তা দিতে গেলেও, ধোঁকা বলে ধরে নেয় সবাই। আওয়ামী লীগ এমনিভাবেই মানুষকে বড় বড় আশার বাণী শুনিয়ে শুনিয়ে আজ তার উল্টো করছে। এ সব বাস্তব প্রশ্নের জবাব কথায় আর কাজের মধ্য দিয়েই দিতে হবে।

নৌকো চালিয়ে কতো পান রোজ?

কতো আর পামু বাবা! কোনো রকম দিন চইলা যায়। তোমরা যুদ্ধ কইরা দেশটারে কি যে কল্লা, এহন ভাত বেগারেই মরতাছি।

এবারও জাফরের মুখে উত্তর জোগালো না। যুদ্ধ তো সেও করেছিলো স্বাধীনতার জন্যে, কিন্তু একি দাঁড়ালো? যেসব লোকের সামান্য জমিজমা ছিলো তারা সেটুকু হারিয়ে আজ নৌকোর মাঝি হলো? মাঝির সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কি হাড়ভাঙা খাটুনি এদের-রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, তুফান সব ভেঙে চলে তারা, সামান্য আয়ের ঝুঁকি নিতে। কতোইবা আর রোজগার তাদের? সারাদিন চালাতে পারলে হয়তো পাঁচ সাত টাকা পায়। পারিশ্রমিক অনুপাতে ভাড়া খুবই কম।

প্রত্যেক মাঝির জীবনের পূর্ব ইতিহাস আছে। আর তা প্রায় সবারই এক গ্রামের মাতব্বর জমিগুলো তাদের ছলেবলে কৌশলে দখল করে ঠেলে দিয়েছে এই পথে। এবং খোঁজ নিলেই দেখা যায় হয়তোবা এরাই আবার করুণার ছলে নৌকো কিনে দিয়েছে। হয়তোবা বলেছে- যাও এখন আর কী করবে। সলিমুদ্দি? একটা নৌকো দিচ্ছি এটা বেয়ে খাও। মাসে মাসে ভাড়াটা ঠিকমতো দিও কিন্তু।

তাদের শোষণের এতো সব পদ্ধতি বুঝে উঠতে না পেরে সলিমুদ্দি নৌকো নিয়ে হয়তো বিনয়ের সঙ্গে বলেছে হুজুর আপনের মতো মেহেরবান দুনিয়ায় আর কেউ নাই।

প্রত্যেক মাঝিরই ইতিহাস করুণ। তাদের সবার মনেই আছে হারানো জমিটুকু উদ্ধার করে আবার হাল-চাষের কাজে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তা আর হয়ে উঠে না। বৈঠা চালাতে চালাতেই একদিন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, নৌকো আর চালাতে পারে না। নিজেদের সময়েই হয়তো মালিকরা নৌকো ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এরপর ভিক্ষে করা ছাড়া তাদের কোনো উপায় থাকে না।

জাফর ভাবলো এসব মাঝিদের সংগঠিত করতে হবে। তাদের বিপ্লবী চেতনা দিয়ে একবার যদি জাগিয়ে তোলা যায় তবে সমাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে। তাদের পরিশ্রমকে উৎপাদনমুখী করতে পারলেই জাতির এবং তাদের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান হবে। মাঝিদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনার সুর জাফর পৌঁছাবেই, তাদের ক্লান্তশ্রান্ত মনে আগুন জ্বালাতে হবে। কিছুক্ষণ ভেবে জাফর বললো-

চাচা আবার সংগ্রাম করতে হবে আপনাদের-

না বাবা, আর সংগ্রামে কাম নাই-হইলে একেবারে ভাতে মরমু।

না, এবার লড়াই হবে বাঁচার লড়াই। আপনাদের সবাইকে এক হতে হবে এক কেমনে অমু? আর এক অইলেই কি। আমরা পারমু সংগ্রাম করতে? কেন পারবেন না?

বাংলাদেশে কমপক্ষে পাঁচ থেকে সাত লক্ষ মাঝি আছে আর নৌকো মালিকের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক কম। হয়তোবা এক হাজার থেকে দুই হাজার হবে। সব মাঝিরা এক হয়ে মালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলে, তাহলে পারবে কি মালিকরা? ওদের শোষণ থেকে মুক্ত হতে হলে আপনাদের মাঝি সমিতি গড়ে তুলতে হবে এবং আপসহীন সংগ্রাম চালাতে হবে।

জাফরের তেজোদীপ্ত কথা শুনতে শুনতে কখন যে ঘাটের মাঝিরা তার চারপাশে জটলা বেঁধে বসে পড়েছিলো জাফরের তা খেয়ালও ছিলো না। তার কথা শেষ হতেই সবাই একসঙ্গে বললো-

জাফর ভাই আপনে ঠিকই কইছেন-আমরা সংগ্রাম করমু আবার, কিন্তু আমাগো চালানোর মতো লোক যে নাই?

আমি আপনাদের সব বুঝিয়ে দেবো, সমিতি গড়ে দেবো-তখন সব কাজ নিজেরাই করতে পারবেন।

আচ্ছা, তা অইলে আইজই একটা সমিতি কইরা দিবেন।

হ্যাঁ আমি আজ সন্ধ্যে সাতটায় এখানে আসবো, আপনারা সবাই থাকবেন। আমার যে ভাড়া যাইতে অইবো। একজন মাঝি বলে ওঠে।

না, আইজ ভাড়া কেউ যাইতে পারবা না। অন্য একজন বাধা দিয়ে বলে। জাফর বললো, যাক না উনি ভাড়া, পরে আপনারা বুঝিয়ে দেবেন। জাফরের কথায় খুশি হলো তারা, নিজ নিজ নৌকোর গলুইয়ে দিয়ে দাঁড়ালো।

জাফর অন্যমনস্কভাবে আইল দিয়ে হাঁটতে থাকে। কদমতলা, বাঁশ ঝাড় পেরিয়ে পুকুরের এক কোনায় ক্ষণিকের জন্য দাঁড়ালো। তাকে দেখে হাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক করে লাফিয়ে পুকুরে পড়লো। জাফর মুচকি হাসলো, ছোটবেলার স্মৃতি মনে পড়ছে তার। ক্ষেতের আইল, কদমতলা, বাঁশ ঝাড়, পুকুর পাড় এ পথ যেনো তার মনের গহনেই লেগে আছে। নিজের অজান্তে স্মৃতি যেনো তাকে এ পথেই টেনে নিয়ে এলো।

অষ্টম অধ্যায়

সন্ধ্যে সাতটার অনেক আগেই জাফর পলাশ বাজারের দিকে বেরিয়ে পড়লো। বাজার থেকে বাড়ির দূরত্ব ছিলো প্রায় আধ মাইলের মতো। বিকেল বেলায় এখানে চায়ের দোকানে বেশ ভিড় জমে যায়। কখনো তাস, লুডু ইত্যাদির আসরও জমে। স্বাধীনতার পরে অবশ্য মানুষগুলো কেমন যেনো আধমরা হয়ে উঠেছে। বাজারের সেই পুরানো জাঁকজমক মোটেও নেই। লোকজন এলেও তাড়াতাড়ি এক কাপ চা খেয়ে, নিজ নিজ কাজে চলে যায়।

এসব দেখে জাফরের মন কেমন যেনো উদাস হয়ে যায়। তবু সে জোর করেই সব কাজ খুশি মনে করতে চেষ্টা করছে।

গ্রামে পাঁচ-দশজনকে এক জায়গায় জড়ো করে শুধু বিপ্লবের কথাই শোনাতে থাকে সে। তাদের বোঝাতে চেষ্টা করে বিপ্লবের কত প্রয়োজন এ অবস্থায়। কখনো ক্ষেতের আইলে বসে, কখনো বাজারের কোনো দোকানে বসে, কখনো তাঁতি বাড়ি, কখনো কৃষকের বাড়িতে বসে, আবার কখনো বা বাজারের কাছে স্কুল ঘরটাতে চলে যায়। গত দশ দিনে সে অনেক এগিয়েছে। গ্রামের তাঁতিদের নিয়ে একটি তাঁতি সমিতি গড়েছে, কৃষকদের কৃষক সমিতি, শিক্ষক সমিতি, ছাত্রলীগ আর আজ সাতটায় মাঝি সমিতির কাজ শুরু করবে।

জাফর মনে মনে একটি গোপন আনন্দ আর উত্তেজনা অনুভব করছে। মাঝিদের কাছে যাবার আগে সে বাজারের দোকান কর্মচারীদের নিয়ে একটা সমিতি গঠন করে ছুটলো নৌকো ঘাটে।

রাত প্রায় দশটা বেজে গেলো তবু জাফর বাড়ি ফিরলো না। ঘরে মা-বাবা বসে বসে জাফরের কথাই চিন্তা করছিলেন। কাছারি ঘরে ছেলে-পিলেরা হৈ-চৈ করে পড়ছিলো। ফালগুন মাসের মাঝামাঝি, তাই বাইরে ফালগুনী হাওয়ার শো শো শব্দ পাওয়া যাচ্ছিলো। বাড়ির ওঠোনে বসে দু'চারজন মুরব্বি গোছের লোক জটলা বেঁধে তামাক টানছে। উঠোনটি বেশ বড়ো। চার কোনায় চারখানা ঘর। জাফরের তিন চাচাই এ বাড়িতে থাকেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে এ বাড়ি তালুকদার বাড়ি নামেই পরিচিত ছিলো।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক-বাহিনী চারখানা ঘরই পুড়িয়ে দিয়েছিলো। জাফরের তিন-তিনটি চাচাতো ভাইকে গুলি করে মারে। তার বুড়ো বাবা চাচাকেও ধরে নিয়ে গিয়ে মারধর করেছে। তার আপন বোনটিকে জোর করে ধরে নিয়ে পৈশাচিক নির্যাতনের পর গুলি করে ফেলে রেখে যায় কদমতলায়।

অপরাধ একটিই-জাফর মুক্তি বাহিনীর কমান্ডার। যুদ্ধের পর জাফর একবারই বাড়িতে এসেছিলো, তারপর চলে যায় ঢাকায়। বাড়িতে তাকে তেমন একটা কেউ পছন্দ করে না। তা সত্ত্বেও সে আবার সংগ্রামের কথা ভাবছে, দিন রাত টো-টো করে বেড়াচ্ছে। অবশ্য চাচাদের এড়িয়ে চলে সে। জাফরের বড় ভাই এখনো পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দি।

একজন ক্যাপ্টেন সে। চাচাদের অবস্থা ভালো হলেও জাফরদের অবস্থা ততোটা সচ্ছল নয়। জমিজমা বিক্রি করে বড় ভাই পড়েছে, জাফর পড়েছে, ছোট ভাই পড়ছে এখনো। ঘর পুড়ে যাবার পরে আর ভালো করে উঠানো হয়নি। পোড়া টিন দিয়েই কোনো রকম দাঁড় করিয়েছে। জাফরের মার চিন্তা শুধু জাফরকে নিয়ে, বড় ছেলের আশা তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। তাঁর বুকে শোক, দুঃখ ও দুশ্চিন্তার তাণ্ডবলীলা চলছে সারাক্ষণ। এমনি গোটা বাংলাদেশে কতো মায়ের বুকে যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে তার ইয়ত্তা নেই আজ। অনেক মায়েরই প্রাণের দুলাল, দুলালীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে পাক হানাদার বাহিনী। আটকে রেখেছে তাদের পাকিস্তানি ক্যাম্পে। জাফরের মা সদা আতঙ্কগ্রস্ত জাফরকে নিয়ে, তাঁর এই বুকের ধনকে, কেউ যেনো ছিনিয়ে নিয়ে না যায়। অনেকদিন ধরেই মনে মনে ভাবছেন ছেলেকে একটা বিয়ে করাবেন, কিন্তু জাফরের কানে কখনো পৌঁছানো হয়নি এ কথা। তাই আজ বুড়ো স্বামীর সঙ্গে পাশাপাশি বসে গল্পের ছলে তিনি প্রস্তাব দিলেন-

শুনছেন এখন জাফুর একটা বিয়ে করানো দরকার।

হুঁ। বলে চোখ বুজে হুঁকায় টান দিলেন জাফরের বাবা।

বুঝলাম তো, কিন্তু মেয়ে কোথায়?

মেয়ে হাতে আছে- লক্ষ্মী মেয়ে। আমাদের শরীফের মেয়ে রুবী আছে না, তারই সাথে।

এতো তাড়াহুড়োর কি আছে? তাছাড়া সেলিম রইলো পাকিস্তানে। বড় ভায়ের বিয়ে না দিয়েই জাফরের বিয়ে দেবো এ কেমন কথা?

বিয়ে না হয় না হোক, শরার কাজটাতো সেরে রাখা যায়।

জাফুর মতামত নিয়েছো?

ওর আবার মতামত কি? রুবী লক্ষ্মী মেয়ে, তাছাড়া শরীফ তো আমার চাচাতো ভাই, মেয়ে ভালো হবেই।

আহ্ তাতো বুঝলাম কিন্তু জাফুর নিজস্ব একটা মতামত আছে না?

সেটা আজ বাড়ি ফিরলে আপনিই জিজ্ঞেস করে নেবেন। গতকালও শরীফ চিঠি লিখেছে ঢাকা থেকে। রুবী নাকি অনেক বড়সড় হয়েছে, এখন আর বেশি দেরি করতে পারবে না তারা। আমাদের তরফ থেকে পাকাপাকি একটা কথা চায়। এই যে দেখেন রুবীর বাবার চিঠি–বলে খামে ভরা চিঠিখানা খুলে স্বামীর হাতে দিলেন এবং হ্যারিকেনটা সামনে টেনে আলো আরেকটু বাড়িয়ে দিলেন।

মান্যবরেষু বোন ও ভাইজান,

সালাম জানবেন। অনেক দিন থেকে একটি কথা বলবো ভাবছি কিন্তু নানা কাজের চাপে তা আর বলা হয়নি।

আপনারা তো রুবীকে দেখেছেন অনেক আগে। এখন অনেক বড় হয়েছে। তাই এখন আর ঘরে বসিয়ে রাখা যায় না, কারণ দিনকাল ভালো না। সামনেই ওর বি. এ. অনার্স

পরীক্ষা। ভাবছি পরীক্ষা শেষেই শুভ কাজটা সেরে নেবো। তাছাড়া জাফরেরও বোধহয় ইচ্ছে আছে, রুবীর মা তা ভালোভাবেই আঁচ করেছে।

তবুও জাফর যখন দেশের বাড়িতে আছে, ঢাকা ফেরার আগে ওর মতামত নিয়ে আমাদের তাড়াতাড়ি জানাবেন আশা করি আমরা সবাই ভালো। আপনাদের কুশলান্তে-

চিঠি পড়ে সোলেমান সাহেব বললেন-

শরীফ ও সালমা।

দ্যাখো শরীফ কত বুদ্ধিমান, স্ত্রীর কথায় পুরো ভরসা না করে আমাদের ও ছেলের মতামত জানাতে লিখেছেন। বর্তমানে এটাই ভালো। খেয়াল খুশিমতো ছেলেমেয়েদের ঘাড়ে বিয়ে চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়। এ যুগে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা তাদের ভালোমন্দের বিচার নিজেরাই করতে চায়। থাক আপনার বক্তৃতা শুনতে চাই নে। এখন জাফর এলে মতামতটা আপনি নিবেন। কালই আমি চিঠির জবাব দেবো শরীফকে আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে পারবো না, তুমিই ও কাজটা করো। সব কাজ আমাকেই করতে হবে বুঝি?

তুমি কোথায় করলে সব কাজ? ছেলেটা তো দু'জন মিলেই উৎপাদন করলাম, বলে মুচকি হাসলেন সোলেমান সাহেব। বুড়ো হলেও তার রসজ্ঞান ছিলো।

মা ভাত বাড়ো, বলতে বলতে জাফর এলো।

ঐ যে জাফু এসে গেছে, আপনি বিয়ের কথা উঠাবেন কিন্তু।

না, আমি পারবো না, বলে হুঁকোটা নিয়ে সোলেমান সাহেব উঠোনে নেমে গেলেন। জাফর ঘরের দিকে রওনা হতেই, সোলেমান সাহেব জিজ্ঞেস করলেন-কোথায় ছিলি এতো রাত পর্যন্ত?

বাজারে বসে বন্ধুদের সাথে গল্প করছিলাম-এটুকু বলে আসল কথাটি চেপে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেলো।

পিঁড়িতে বসার সময়ই মা জিজ্ঞেস করলেন।

কোথায় ছিলি এতোক্ষণ? দিনকাল ভালো না আর তুই এই রাত-বিরেতে একা একাই ঘুরে বেড়াস?

না, মা, বাজারে অনেক বন্ধুদের সঙ্গে ছিলাম।

বুঝলাম তো, কিন্তু একটু সাবধানে চলিস বাবা, এখন তুই ছাড়াতো আমাদের কেউ নেই।

ভয় নেই মা, যুদ্ধে যখন মরিনি এখন আর মরবো না।

এটা আবার কেমন যুক্তি? যুদ্ধে না মরলে বুঝি আর কেউ মরে না? গুপ্ত ঘাতকের হাতে যে কোন সময় মানুষের মৃত্যু হতে পারে। এখন তো খুন করে লাশ পর্যন্ত গুম করে দিচ্ছে হরহামেশাই।

মরলে আর কি করা যাবে-ভাত মুখে দিতে দিতে জবাব দেয় জাফর।

বাহ্ এটা কেমন কথা? তাই বলে তুই সতর্ক থাকবি না?

জাফর কোনো কথা না বলেই চুপচাপ খাওয়ায় মন দিলো।

কিছুক্ষণ পর জাফরের মা হাল্কা করে বললেন, এমনি টো টো করে কতোদিন বেড়াবি? তোকে এবার বিয়ে করতে হবে।

কি যে বলো মা? বিয়েটিয়ে আমার দ্বারা হবে না। এখনো অনেক পড়াশোনা, অনেক কাজ বাকি বলে হাত ধুয়ে উঠে পড়ে

শোন্ আর দোটানা না করে এবার ওদেরকে আমার পাকা কথা দিতে হবে। কাদের আবার কথা দিতে হবে?

তোর শরীফ মামাকে? বলে ছেলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মা।

মা, ওসব ঝামেলার কথা রাখো, অন্যসব আদেশ তোমার পালন করতে রাজি, কিন্তু এটা না। তা করলেও পরে দেখা যাবে।
এখন তো আর বিয়ে হতে যাচ্ছে না, শুধু শরার কাজটা হয়ে থাক,
পরে হবে।
শরা হলে বা না হলেই বা কি আসে যায়?
বাকিটা
ওমা শোনো ছেলের কথা! মেয়েটা হাতছাড়া হয়ে যাবে না? তোর জন্য চিরদিন বসে থাকবে তারা?
অতো আমি জানিনে, কিন্তু-
কিন্তু-টিন্তু শুনতে চাইনে, কালই আমি রুবীর মা-বাবাকে লিখে দেবো। সে তোমার যা ইচ্ছে.....
ইচ্ছে ইচ্ছে করিসনে, আমাকে দুঃখ দিসনে। সত্যি করে বলতো তোর অন্য কোথাও মন চায় কিনা।
না, সে কথা নয়। তোমাকে সব বোঝাতে পারবো না মা।
কেনো তুই সব খুলে বল- আমি আজ সব শুনবো। কেমন যেনো খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে মা চেয়ে রইলেন জাফরের দিকে।
শোনো মা, আমি আজকাল ব্যস্ত। এ দেশে আবার সংগ্রাম হবে চরম সংগ্রাম এবং সে সংগ্রাম শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।
এ তুই কি বলিস! যেনো ভয় পেয়ে আঁতকে ওঠেন মা। সাবধান! আমি নিষেধ করছি- ও পথে আর যেতে পারবি নে তুই। আমার লক্ষ্মী মেয়েটি হারালাম, বড় ছেলে হারানোর পথে, ঘরবাড়ি সব গেলো-এখন আবার তুই- বলেই কান্নায় স্বর বুজে এলো মায়ের।
মা তুমি কেঁদো না। এদেশে কতোশতো সোনার ছেলে এই সরকারের আক্রোশে পড়ে প্রাণ হারাচ্ছে; কতোশতো লোক না খেয়ে মরছে তার কোনো হিসাব আছে? তাদেরও তো মা আছে? তাদের মায়ের প্রাণেও তো ব্যথার আগুন জ্বলছে। তাদের কথা একবার চিন্তা করো মা।
কিন্তু তুই একা তাদের কী করবি? তোরাই তো এই সরকারকে গদিতে বসানোর জন্যে যুদ্ধ করেছিলি, আবার কেনো তার বিরুদ্ধে তোদের সংগ্রাম? তোদেরই তো সব দোষ।
মা, মুজিব সরকার এ জাতির সাথে বেইমানি করেছে, ধোঁকা দিয়েছে বাংলাদেশের আট কোটি মানুষকে। আমরা আগে জানতাম না তাদের আসল রূপ, এখন চিনেছি। অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের দল জনযুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

তোদের আবার কোন দল? আবার নতুন দলে গেলি নাকি?

হ্যাঁ মা, '৭২ সালের ৩১ অক্টোবর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠিত হয়েছে, এখন সেই দল করছি আমি। এ দলের নেতৃত্বে এদেশে গড়ে উঠবে কৃষক শ্রমিক রাজ, এ দেশের মানুষ মুক্তি পাবে মা।
আর আমাদের মুক্তির দরকার নেই বাপু, যা এনেছো তাতেই আমরা সর্বস্বান্ত। তুই রাজনীতি ছেড়ে দে জাফু, আমার কথা রাখ। তোকে হারালে আমি পাগল হয়ে যাবো।
আমি মরলে তোমার শতো ছেলে জন্ম নেবে। বিপ্লবীরা মরে না মা।
মরে না, বেঁচে থাকে! সরকার যদি গুলি করে মেরে ফেলে তোদের, কি করবি তখন?
আমরা প্রতিশোধ নেবো। চরম প্রতিশোধ। মুষ্ঠি আবদ্ধ করে উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দেয় জাফর।
শোধ নিলেই হলো, তোকে তো কোলে ফিরে পাবো না আর। উৎকণ্ঠায় ভিজে আসে মায়ের দু'চোখ।
মন শক্ত করো মা।
জাফর তার মাকে জড়িয়ে ধরে।
হাসিখুশি মনে আমায় যদি আশীর্বাদ করো তাহলে আমি কখনো মরবো না। আর একটা সন্তান মরলেই বা কি? জাতির মূল্য যে আরো বেশি। তোমার বাঁধন মুক্ত করো মা।
তোর কথা আমার মাথায় ঢোকে না। তোর যা মনে হয়, তাই কর আমি কিচ্ছু জানি নে। কিন্তু কালই আমি শরীফকে চিঠি লিখে জানাবো যে, এ বিয়েতে অমত নেই তোর! বুঝলি?
সে দেখা যাবে। খুশিতে বলে ওঠে জাফর-এখন রাত হয়েছে অনেক, শুয়ে পড়ো গিয়ে।
খাওয়ার ঘর ছেড়ে পা বাড়াতেই পিছন থেকে আবার ডাক শুনলো জাফর-শোন্ জাফু। থেমে পিছনে তাকাতেই জাফরের মা ছেলের মাথায় হাত রেখে বললেন-

তুই সংগ্রাম কর আর বিপ্লবই কর, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আমার অনেক দিনের আশা, এ বিয়েতে তুই অমত করিসনে।
জাফর এবার না হেসে পারে না। মুচকি হেসে মনে মনে ভাবলো- রাজনীতি করার আদেশ সে তো পেয়েছি, আর রাজনীতিই তো আসল, বিয়ে তো একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্র। মায়ের কাঁধে হাত রেখে বললো- তোমার যা ইচ্ছা মা।

নবম অধ্যায়

ঈদের দিনটাই হুল্লোড় কাটলো। সারা মন্ত্রীপাড়া ঘুরে বেড়িয়েছে রোজী। এ ঈদে অনেক উপহার পেয়েছে সে, কিন্তু সকাল থেকেই সাদা একটি শাড়ি ছিলো তার পরনে। বিষয়টি ছিল সকলের অনুমানের বাইরে, মন্ত্রী-মন্ত্রীগিন্নি মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছেন নীরবে। কিছুদিন থেকে কি একটা পরিবর্তন তারা লক্ষ করছেন মেয়ের মধ্যে। কিন্তু তা যে কী, বুঝে উঠতে পারেননি। ফরিদা বেগম উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতেই জামান সাহেব বললেন- ও কিছু না। আমি যেমন পাঞ্জাবি পরেছি আজ, তেমনি একটা কিছু হবে আর কি?

পোশাক-পরিচ্ছদ যাই পরুক না কেন, হৈ চৈ, আনন্দ প্রকাশে রোজীকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি কেউ।

সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে জামান সাহেব যখন বাসায় ফিরলেন, তার মুখ ছিলো গম্ভীর, চিন্তাক্লিষ্ট।

খানিকবাদেই মায়ের কাছ থেকে শুনতে পেলো রোজী- আজ ১৬ জানুয়ারি ঈদের দিন বেলা ১২টা থেকে আমরণ অনশন শুরু করেছেন প্রবীণ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ। দেশে গুপ্ত হত্যা, সন্ত্রাস, রাজনৈতিক সংঘর্ষ, ছিনতাই প্রভৃতি হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতিবাদে তার এই অনশন।

রোজী অবাক হয় একজন সাহিত্যিকের এ ভূমিকার কথা শুনে। দেশ আর রাজনীতির কথা সে ভাবেনি কখনো। দেশে গুপ্তহত্যা, সন্ত্রাস আর রাজনৈতিক সংঘর্ষের কথা গুরুত্ব পায়নি কখনো তার কাছে। কিন্তু আজ তার মনে পড়লো-দেয়ালে দেয়ালে যে স্লোগানগুলো শক্তিশালী হচ্ছে দিন দিন তার বোধহয় একটি অর্থ আছে। ২ জানুয়ারিতে ভিয়েতনাম দিবসে ছাত্রদের যে মিছিল বেরিয়েছিলো, গুলি চলেছে সে মিছিলে, ছাত্র নিহত হয়েছে। প্রতিবাদ হয়েছে হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল, প্রকাশ্য সভায় শেখ মুজিবের 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে হামলা, ছাত্রনেতা আম্বিয়া মাহবুবকে প্রহার-এসব কিছুই তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে একের পর এক। ক্লাস চলার সময় ক্রুদ্ধ মিছিলের আওয়াজে বিরক্ত হতো সে, সে বিরক্তি জেদে পরিণত হতো যখন তার সহপাঠীরা মিছিল থেকে চোখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকাতো। যেন মন্ত্রীর মেয়ে হয়ে আক্রমণের সেই হয়েছে লক্ষ্য। সরব বটতলার দিকে কখনো তাকায়নি রোজী। কিন্তু ঈদের ছুটি শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েই একটি মুখকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে। তার কাছ থেকে সবকিছুই জানতে চায় সে।

ক্রুদ্ধ বটতলার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে একা একা দাঁড়িয়েছিলো দ্বিতলের দক্ষিণ বারান্দায়। পিছন দিয়ে সরকারি ছাত্রদলের একটি মিছিল চলে গেছে। মিছিল থেকে তার নাম ধরে ডেকেছিলো কেউ একজন, রোজী ফিরে তাকায়নি। বহুবার সাগর পাড়ে বেড়াতে গেছে রোজী, সৈকতে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সাগরের উত্তাল তরঙ্গ দেখেছে,

দু'কান ভরে শুনেছে ক্রুদ্ধ গর্জন। আজ যেনো একই নেশায় পেয়েছে তাকে। বটতলায় যে তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে, গর্জন ভেসে আসছে কানে, তাতে মনে হচ্ছে কলাভবনের একদম কাছাকাছি চলে এসেছে বঙ্গোপসাগর।

তখন ক্লাস ছিলো না, সেমিনারে বসে নোট তৈরি করছিলো রুবী। এখান থেকে দরজা বরাবর রোজীকে দেখা যায় বারান্দায়। একটু অবাকই হয় সে, মিছিল দেখলে যে রোজীর ভ্রু কুঁচকে আসে বিরক্তিতে, সে আজ একাগ্রচিত্তে দাঁড়িয়ে আছে বটতলার দিকে তাকিয়ে।

বইখাতা রেখে উঠে আসে সে। রোজীর একদম গা ঘেঁষে দাঁড়ালেও সে যখন টের পেলো না, বললো না কোনো কথা, রুবী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলো রোজীর দু'চোখ মিছিলটাকে চষে বেড়াচ্ছে ইচ্ছেমতো।

কাকে খুঁজছিস মিছিলে?

চিমটি কেটে চমকে দিয়ে হেসে ফেলে রুবী। রোজী একবার তার দিকে ফিরে আবারো মিছিলের উপর চোখ রাখে। তারপর একদম অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দেয়-

জাফরকে খুঁজছি মিছিলে।

এবার রুবীর চমকাবার পালা।

কোন জাফর? প্রশ্ন করে সে।

একজন বিপ্লবী। একজন গায়ক।

রুবীর মনে পড়ে, গতকাল ক্লাসে বসে এক মনে খাতায় আঁকিবুকি করছিলো রোজী। একটি মানুষের মুখ আঁকতে চেষ্টা করছিলো বারবার। টিপ্পনী কেটে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করেছে রুবী কার ছবিরে?

আমার প্রেমিকের! হেসে জবাব দিয়েছে সে।

বটে, আজকাল মহাপ্রেমিকা হয়েছো। বসে ছবি আঁকছো প্রেমিকের, প্রেমিকা হলেই আর্ট-ফার্ট একদম সোজা জলবত্তরলং হয়ে যায়....!

কথাটি শেষ করতে পারেনি। শরীফ স্যার কথা বলতে দেখে দু'জনকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। একটি কথাও কেউ বলেনি দাঁড়িয়ে। রুবী লক্ষ করেছে দ্রুত সেই কাগজগুলো লুকিয়ে ফেলেছে রোজী।

কিন্তু জাফরকে সে ভালোবাসে কেমন করে? যতদূর মনে পড়ে তাকে একবার মাত্র দেখেছে রোজী। সেই জোর করে তাকে ঐ গানের আসরে নিয়ে গিয়েছিলো সেদিন। বান্ধবীর কথায় কান ঝাঁঝাঁ করে ওঠে তার, সারাটা জগৎ যেনো অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে ওঠে, দম আসে বন্ধ হয়ে।

জাফর কি তাহলে রুবীকে ধোঁকা দিয়ে অবশেষে রোজীর আঁচলেই ধরা দিলো! আর এজন্যই কি জাফর তাকে এড়িয়ে চলে সারাক্ষণ। তা না হলে কেনোই বা হঠাৎ দেশের বাড়িতে চলে গেলো তাকে না জানিয়ে। ছি ছি জাফর এতো নীচ! তাদের খেয়ে তাদের সাথেই বেঈমানি। রুবীর ঠোঁটে বাঁকা হাসি খেলে যায়। বিপ্লবীদের কি বৈপ্লবিক অধঃপতন? সর্বহারার কথা বলে বলে শেষে বুর্জোয়ার পা-কেই বুকে চেপে ধরে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে অনেক লেকচার সে শুনেছে ডক্টর আহমদ শরীফের ক্লাসে, সাহিত্যের ক্লাসেও যিনি রাজনীতি আর অর্থনীতি পড়ান। এখনো আরো মনে হলো, অর্থনৈতিক ব্যাপারটিই মূল, নইলে একই রকম দেখতে যে রুবী, রোজী। ওদের একজন কেরানির মেয়ে বলে প্রত্যাখ্যাত হয়, অন্যজন মন্ত্রীর মেয়ে বলেই ভালোবাসা পেয়ে যায়।

জাফর নিজেকে একজন বিপ্লবী বলে পরিচয় দেয়, বিপ্লবীদের প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে রুবীর। জাফর যে ভণ্ড বিপ্লবী এ কথা ভেবে মনে মনে তৃপ্তিই পেলো সে।

আমি জাফরকে খুঁজছি। তাকে আমার বড়ো দরকার। যতো টাকা লাগে, ওকে আমার চাই-ই চাই। গড়গড় করে বলে যায় রোজী।

এবার রুবী সরাসরি জাফরের পক্ষে চলে যায়। মনে মনেই। টাকা আছে বলেই যেনো তা দিয়ে ভালোবাসা কেনা যায়। মনের কথা তীর্যকর পে বেরিয়ে আসে তার-

টাকা দিয়ে একজন বিপ্লবীকে কেনা যায় নারে?

রোজীর ভ্রূ কুঁচকে আসে, আর কথাটি বলেই অন্যদিকে পা বাড়িয়েছে রুবী। তারপরও দাঁড়িয়েছিলো রোজী সেখানে দাঁড়িয়ে বটতলার বিক্ষোভ দেখেছে। যতোখানি সম্ভব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দু'চোখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খুঁজেছে জাফরকে। কতোক্ষণ এভাবে আরো দাঁড়িয়েছিলো খেয়াল নেই-রুবী এসে পাশে দাঁড়ালে সম্বিত ফিরে পায়।

মাথা নীচু করে রুবী বলে চল যাই। বাসায় যেতে হবে।

অন্যদিনের মতো গাড়ি পার্কে এসে রোজীকে বিদায় জানাতে রুবী বলে

জাফর ঢাকায় নেই, সে এখন গ্রামের বাড়িতে।

তুই ওকে চিনিস?

মোটামুটি। বিপ্লবী না ভণ্ড তা অবশ্য জানিনে।

বাজে কথা বলছিস যে, ওতো বিপ্লবীই।

তা হলে তোকে সে ভালোবাসে কি করে?

চমকে উঠে রোজী রুবী উভয়েই। এই-ই প্রথমবারের মতো তাদের মধ্যে একটি তীক্ষ্ণ কথার আদান-প্রদান হয়ে গেলো।

এরপর কয়েকদিন ক্লাসে আসেনি রুবী। রোজী প্রতিদিন তার অপেক্ষা করে। তার ভয়, পরিচিতির দাবিতে রুবী যদি কোনোদিন জাফরকে ঐ টাকার ব্যাপারটি জানিয়ে দেয়। সেদিন বিকেলে বাসায় ফিরে বাবার কাছে শুনতে পেলো, সাত দিন অনশনের পর ওয়ালীউল্লাহ অনশন ভেঙেছেন। অনশন ভাঙাতে রোজীর বাবাও নাকি গিয়েছিলেন তাদের দল আর সরকারের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি গ্রুপের সাথে।

মনটা খুশি হয়ে ওঠে রোজীর। আর খুশির ভাবটি আসতেই ইচ্ছে হলো রুবীর সাথে দেখা করে আসবে। রওনা দিলো কাপড় না পাল্টিয়েই রুবী উদাস দৃষ্টিতে বসেছিলো বারান্দায়, সহসা গাড়ির আওয়াজ আর পরক্ষণেই দরজার কাছে এসে থামতে দেখলো রোজীর গাড়িটিকে শশব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে বাইরে এলো সে।

গরিবের ঘরে হাতির পা। দেখতে রাজকুমারী, আদতে মন্ত্রী দুলালী, কোথায় বসতে দেই তোকে। হাসিমুখে বললো রুবী।

জবাবও এলো হাসিমুখে, কৃত্রিম কোপের সাথে-

জানোয়ার বানিয়ে দিলি একেবারে? না হয় তোর শত্রুই হলাম একদম সতীন যে তুই। হো হো করে হেসে উঠে দু'জনেই। এমন সময় কে এলো আমাদের গরিব ঘরে?' বলতে বলতে এলেন রুবীর মা।

রোজী দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পায়ের ধুলো নেয় তাঁর। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রুবীর মা বললেন-

হু। এতকাল পরে বুঝি মনে পড়লো গরিব খালাম্মাকে। তোর মা কেমন আছেরে? তোর বাবা মন্ত্রী হয়েছেন পর থেকে তোদের তো আর দেখাই যাচ্ছে না। বড়লোক হলেই বুঝি ডুমুরের ফুল হতে হয়, তাই না রে?

না খালাম্মা, নানা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাছাড়া দেশের বাড়ি থেকে সব কিছু নিয়ে ঢাকায় 'সেটেল' হতেও অনেক ঝামেলা ছিলো।

'সেটেল' কথাটি সে এমনভাবে বললো যেন একটি চিরস্থায়ী সরকারের চিরস্থায়ী মন্ত্রী ওর বাবা।

এ বাড়িঘর রোজীর খুব ভালো করে চেনা। স্বাধীনতার আগে সে অনেকবার এসেছে, খেয়েছে, আড্ডা মেরেছে। খালাম্মাকে পাকের ঘরে পাঠিয়ে রুবীর ঘরে ঢুকে সে। বিছানায় গা এলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে- উহ। মনে হচ্ছে এক যুগ পরে তোর কাছে ফিরে এলাম। তারপর বললো-এ কদিন কি হয়েছিলো তোর? ভার্সিটিতে যাসনি যে?

শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। নির্বিকার জবাব দেয় রুবী। কিন্তু তুই হঠাৎ কি মনে করে বলতো? জাফরের খোঁজে? বলেছি তো সে এখন গ্রামের বাড়িতে।

তোর কথায় এতো ঝাঁঝ কেনো রে? জাফর তোর বর নাকি যে হিংসায় জ্বলে যাচ্ছিস। নইলে কতোদিন পরে তোদের বাড়িতে এলাম কোথায় একটু যত্ন আত্তি করবি।

ঠিক আছে বাবা, মাফ চাইছি।

মাফ করলাম। হেসে ফেলে রোজী। তারপর বলে এসেছি জাফরের খোঁজেই। মনে হয় ওকে চিনিস তুই। সে কোথায় থাকে বলতো।

তাকে নাকি পুলিশও খুঁজে বেড়ায়। তুই কি টিকটিকি?

টিকটিকি না তেলাপোকা সে দেখা যাবে। তুই বল। বলে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একখণ্ড কাগজ বের করে বললো-দেখতো কেমন এঁকেছি।

মেয়েটি বদ্ধ উন্মাদ, নইলে কি একটা এঁকে তাকে দেখাচ্ছে প্রেমিকের স্কেচ বলে। রুবী মিছেমিছি বললো-

ভালোই তো তোর কল্পনাশক্তি, একবার তো মাত্র দেখেছিস বোধহয়।

আসলে এ কথায় সে রোজীর কাছ থেকে জানতে চায় ওদের দু'জনের মধ্যে প্রায়ই দেখা হয় কিনা।
মনের মতো মন থাকলে একবার দেখেই আঁকা যায়। আহ্লাদিত হয়ে বলে রোজী।
রোজীর কোলের উপর বিছানো ছিলো স্কেচ আঁকা কাগজটি। নিজের সৃষ্টি নিজেই ভালো করে দেখতে লাগলো রোজী।
ভালো যদি হয়, তবে একটা প্রণাম করিসনে কেন?
হুঁ, আবার প্রণাম। উহ আচ্ছা। এই যে প্রণাম করছি-বলে কোলের উপর রাখা কাগজটির উপর নুয়ে কপাল ঠেকালো রুবী। আর খিলখিল করে হেসে উঠলো রোজী বাসে। বাসে। এবার কপাল তোল।
কিন্তু কপাল তুলতে দেরি করে ফেলেছে রুবী। কিছু একটা হচ্ছে ভেবে দু'হাতে তার মাথা ধরে উঁচু করলো রোজী। অবাক বিস্ময়ে দেখলো দু'চোখের পাতা ভিজে এসেছে তার।
তোর চোখে পানি কেনো রে? থতমত খেয়ে শুধালো রোজী
রুবী অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। কিন্তু নীরব থাকা সমীচীন নয়। সে বললো- কই না তো।
না মানে? মিছে বলিসনে। তুই ওকে ভালোবাসিস।
আরে না। যত্তোসব কল্পনা তোর।
তবে এমন করছিস কেনো? দু'চোখ পানিতে ভরে উঠলো কেনো?
ছাড় তোর যত্তো বাজে কথা। কদিন ধরে অসুস্থ আমি। মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেলো।
সত্যি তাহলে তুই ওকে ভালোবাসিসনে। বাঁচিয়েছিস আমায়। আমিতো সেদিন থেকেই তোর ভাবভঙ্গি নিয়ে চিন্তায় অস্থির।
আহ্লাদে গলে যায় সে। বলে- শোন ভাই, তুই যদি চিনিসও সামনে পড়িসনে। তাহলে কিন্তু তোকেই ভালোবেসে বসবে। দেখতে তো আমরা দু'জন যমজ বোনের মতোই। কতোজন না ভুল করে।
তারপর হাসতে হাসতে বলে-হাসতে হাসতে খুব হালকাভাবে বলছি, কিন্তু একদম আমার মনের কথা জানিস চুপ করে থাকে রুবী। মনের একখণ্ড কালো মেঘ যেন বিস্তারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, এখুনি বুঝি ডানা মেলে কালবৈশাখী আসবে-উড়িয়ে নেবে তার রঙিন জগৎটাকে।

পাশাপাশি চুপচাপ শুয়ে রইলো দু'জন-একজনকে নিয়েই সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তা দু'জনের; একজনের মনে রঙিন স্বপ্ন অন্যজনের মনে দুঃস্বপ্নের ভয়াবহতা।
এক সময় রোজী বললো আমার বড্ড ভয় করছে বুঝলি। গতরাতে মায়ের সাথে আলাপ করতে করতে বাবা বলছিলেন বাংলাদেশের সব বিপ্লবীকে নাকি গুলি করে হত্যা করবে। জাফরও যে বিপ্লবী, কখন কোথায় কি ঘটে যায়, আমি তো ভেবেই অস্থির। সরকার নাকি রক্ষীবাহিনী, যুবলীগ আরো কি সব লীগ আর বাহিনীকে গোপন

আদেশ দিয়ে দিয়েছে। ভাড়াটে গুন্ডা দল রেখে তাদের হাতে নাকি আগ্নেয়াস্ত্র পর্যন্ত তুলে দিয়েছে। বলতো জাফরকে কি করে বাঁচানো যায়?

সে পরে চিন্তা করে দেখা যাবে; আর কি বলেছে তোর বাবা? এবারে উপুড় হয়ে শুয়ে রোজীর মুখের দিকে উদ্বিগ্ন হয়ে তাকিয়ে রইলো রুবী। আর বলেছে আগামী ৭ই মার্চের জাতীয় নির্বাচনে বিরোধী দলীয় কোনো প্রার্থীকে জয়ী হতে তারা দেবে না। এজন্য নাকি পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গণভবনেই এর কন্ট্রোলরুম রাখবেন। সব ক্ষমতা থাকবে তাঁর হাতে। এজন্য লক্ষ লক্ষ টাকার নোট ছাপা হয়ে এসেছে ভারত থেকে। তারপরও যদি কোনো বিরোধী প্রার্থীর জেতার সম্ভাবনা দেখা যায় রক্ষীবাহিনী, পুলিশ, যুবলীগ এদের প্রতি আদেশ থাকবে ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের। বাংলাদেশের প্রত্যেক ইউনিভার্সিটি কলেজ মুজিববাদী ছাত্রলীগের কর্মীদেরও নাকি অস্ত্র দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনে রব-সিরাজ গ্রুপকে কিছুতেই জিততে দেবে না ওভাবে। এসব নিয়ে মা'র সাথে বাবার তর্ক হয় মাঝে মাঝে। বাবা কোনো কোনো সময় নিজেই... থাক ওসব। না থাকবে কেনো বল না। কৌতূহলী হয়ে বলে রুবী।

কোনো কোনো সময় বাবা নেশার ঘোরে নিজেই অনেক কথা মাকে জানিয়ে দেয়।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে রোজী-

ও বাপু, সন্ধ্যে হয়ে এলো যেতে হবে আমাকে এক্ষুনি। ওঠে দাঁড়ালো সে। এমন সময় ববিকে সাথে নিয়ে ঘরে ঢুকেন রুবীর মা। হাতে মিষ্টি বোঝাই ট্রে।

একি খালাম্মা, মিষ্টি কেনো আবার?

খাও মা। আজ একটা ভালো সংবাদ পেলাম, আর তুমিও এলে।

রোজী জিজ্ঞাসু নেত্রে রুবীর দিকে তাকাতেই রুবী মাথা নত করে। আর চেঁচিয়ে সংবাদ জানায় ববি-আপার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

কোথায়? জিজ্ঞেস করে রোজী।

জাফর ভাই-এর সাথে।

জাফর!

সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে রোজীর। রুবীর মা বলেন আমাদেরই আত্মীয়ের ঘর। সম্পর্কে ভাগ্নে। এ বাসাতেই তো ছিলো এতোদিন। জাসদ করে। নির্বাচনেও দাঁড়িয়েছে বরিশাল থেকে।

জাফর ভাই ভালো গান গাইতে পারেন রোজী আপা।

রোজীর মনে হলো, পড়ে যাবে এক্ষুনি। সামলে নিতে চেয়ারে বসে পড়লো সে। রুবী ততক্ষণে অন্য ঘরে চলে গেছে।

দশম অধ্যায়

রোজী এসেছিলো বেড়াতে এ খবরটি রাতে পেলেন শরীফ সাহেব, অর এক বন্ধুর বাসা থেকে ফিরে এসেই। কতোদিন তাকে দেখেননি, কেমন না জানি হয়েছে এখন দেখতে-মনের খেয়ালে বন্ধুর বাসায় বেড়াতে যাওয়ার সাথে নিজের দুর্ভাগ্যকে এক সূত্রে গেঁথে নিলেন মনে মনে। এ বাসার সবাই জানে, নিজের ছেলেমেয়েদের চেয়ে রোজীকে বেশি ভালোবাসেন শরীফ সাহেব। আগে সে যখন আসতো, ধার করে হলেও দোকান থেকে নিজ হাতে মিষ্টি এনে খাইয়ে দিতেন। পাশে বসিয়ে কথার পরে কথা বলে যেতেন। আজ তাই, বাসায় ফেরার সাথে সাথে তাঁর স্ত্রী যখন বললেন, 'তোমার ছোট মেয়ে এসেছিলো গো'। শরীফ সাহেব মুহূর্তের জন্য হলেও আবেগে শ্বাসরুদ্ধ হয়েছিলেন।

'আমারই মেয়ে বটে' বিড়বিড়িয়ে বললেন তিনি। তারপর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন-কতো বড়ো হয়েছে সে এখন, কেমন হয়েছে দেখতে, তাকে মিষ্টি খাইয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা ইত্যাদি।

মিষ্টি খাওয়ানোর কথা শুনে আগের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে রুবীর মা'র। এ নিয়ে কম রসিকতা করেননি স্বামীর সাথে। কতোবার দুষ্টামি করে জিজ্ঞেস করেছেন, "হ্যাগো, রোজীর মার সাথে তোমার কতদিনের সখ্যতা গো?" এসব কথার উত্তর দেন না শরীফ সাহেব, স্ত্রী তাতেই মজা পায় বেশি।

হেসে রুবীর মা বললেন, খাইয়েছি গো খাইয়েছি। আমি কি এতোই বোকা! বাসায় গেলে ওর মা যদি জিজ্ঞেস করেন 'হ্যারে রোজী, তোর বাবা তোকে কি খাইয়ে দিলো, বেচারী তখন কি বলবে নইলে?

ওকে যদি মনের মতো ঘরে বিয়ে দিতে পারতাম। একমনে বিড়বিড় করতে থাকেন শরীফ সাহেব।

আগে বড়োটি পার করে দাও, তারপর জাফরের মা-বাবা তো মত দিয়ে দিয়েছেন। এখন একদিন গিয়ে দিন তারিখ ঠিক করে এসোগে।

জাফরের কি আর এসব দিকে নজর দেবার সময় আছে আজকাল? নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে-নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত সে এখন।

তুমি গিয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে আসো ছেলেটিকে। রাজনীতি করা ছাড়তে বলো আজকের পত্রিকায় লিখেছে ভোলায় মেজর জলিলের উপর গুলি হয়েছে। আহত হয়েছে নাকি কয়েকজন। জাফরও তো বরিশালেই। তার কিছু হয়েছে কিনা কে জানে? কতোবার মানা করলাম, রাজনীতি করে কাজ নেই, তবু..........

সে শুনবে না আমাদের কথা। বললেন শরীফ সাহেব।

কার কথা বলছো, বাবা?

বলতে বলতে ঘরে ঢুকে রুবী।

তোমাদের জাফর। ছেলেটা পলিটিক্স করেই মরলো। কিছু তো করতে পারবে না দেশের, শুধু শুধু নিজের ক্ষতি। মেজর জলিলটা একটা গুলি খেয়ে মরতো যদি, বাঁচা যেতো। তাহলেই জাফর হয়তো সিধে পথে আসতো। দারুণ উষ্মাভরে কথাগুলি বললেন শরীফ সাহেব।

মেজর জলিল মরবেন কেন? তাঁর কি দোষ? জাফর নিজেই তো ও পথে গেছে। বেশ ঝাঁঝের সাথে বলে রুবী।

বুঝলাম তো, কিন্তু ওকে ফিরিয়ে আনা যায় কীভাবে? তুই না হয় একটা চিঠি লিখে দে নির্বাচন-টির্বাচন ছেড়ে তাড়াতাড়ি ঢাকায় চলে আসতে। আমি কেনো দেবো? অভিমানভরা কণ্ঠে জবাব দেয় রুবী। জবাব দিয়েই চলে যায় নিজের রুমের দিকে। তার মা ও বাবা বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন ওর যাওয়ার ভঙ্গিমার দিকে। খানিক বাদে শরীফ সাহেব বললেন, ওর কি হয়েছে আজকাল বলোতো। মেজাজ চড়া থাকে দেখি সারাক্ষণ। হবে আর কি? নিশ্চয়ই জাফরের উপরেই রেগে আছে। খোঁজখবর কিছুই দেয় না জাফর। তোমার একবার যাওয়াই ঠিক।

গিয়েই বা করবো কি? সে তো নিজের জীবনের কোনো মূল্যই বুঝলো না। সবসময় ছুটে বেড়াবে বস্তিতে বস্তিতে, এখানে সেখানে। কখনো ওকে দেখেছি স্টেশনের কুলিদের সঙ্গে, কখনো বা রাস্তার পাশে বসে থাকা খেটে খাওয়া মজুরদের সাথে। ঠিকমতো খাবে না, ঘুমাবে না। স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে কি যে হলো ছেলেটার? আমার তো ভয় হয় একদিন কোথাও....

থাক থাক ও কথা মুখে এনো না। বাধা দিয়ে বলেন রুবীর মা।

তা বলছি না। কিন্তু তবু ভয় হয়। তাছাড়া ও যে দলের রাজনীতি করে, মুজিববাদীরা সে দলটিকে পিষে মারতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। জানতে পারলে আমার চাকরিটাই কোনোদিন না খেয়ে দেয়। সেদিন চীফ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে একটি মুজিববাদী ছেলে এসেছিলো। জাফরের মতোই বয়স, মাথায় লম্বা চুল, পরনে ফিটফাট পোশাক। টেবিলের উপর থাপ্পড় মেরে বললো-ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, সব টেন্ডার আমাদের লোকদের দিতে হবে। মুজিববাদী ছাড়া কাউকে দিলে আপনাকে ছাড়বো না বলে দিচ্ছি।

অতটুকু ছেলের মুখে অতো বড়ো কথা শুনে শরীরটা আমার রাগে জ্বলে উঠছিলো। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে দেখলাম ভয়ের চোটে জ্বী হুজুর, জ্বী হুজুর ভাব। বেচারা কোনো কথাই বলতে পারলো না। দেশটার কি যে হয়ে গেলো তাই ভাবছি। ঐসব মুজিববাদী ছেলেরা টেন্ডার দিতে আসে শুধু টাকা রোজগারের জন্যে। অথচ কোনো কাজ তাদের দ্বারা হয় না। রাস্তার কন্ট্রাক্ট নিলে হয় তো দুই বস্তা বালি আর কিছু ইট ভেঙে কয়েকটা গর্ত পুরে আসবে পুরো সড়ক মেরামতের বিল নিয়ে। আসলে কোনো কনসট্রাকশন করছে না। বেচারা ইঞ্জিনিয়ার চাকরি রক্ষার স্বার্থে তদন্ত না করেই বিল পাস করিয়ে দেন। তাইতো স্বাধীনতার পর থেকে সব রাস্তাঘাট প্রায় অচল হয়ে পড়ে আছে।

থাক আপনি ওদের ধারে কাছেও যাবেন না। শুনছি ওরা যাকে-তাকে পথেঘাটে বেইজ্জত করে, মারধর করে, এমন কি গুলি করেও নাকি রাস্তাঘাটে ফেলে রাখে।

হ্যাঁ, এ রকম কতো ঘটনাইতো ঘটছে রোজ। প্রতিদিনই খবরের কাগজে মানুষ গায়েব, মানুষ হত্যার খবর থাকে। ক'দিন আগে গণকণ্ঠে দেখলাম-গত এক বছরে ব্যাংক ডাকাতি হয়েছে ৩১টি, গুপ্তহত্যা ১৪৬৭টি, ডাকাতি ২০৩৯টি আর ছিনতাই হয়েছে ১৭৩৪১। প্রায় ৮ কোটি টাকার নগদ অর্থ নাকি লুট হয়েছে এ পর্যন্ত। মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ কি আর এমনি এমনি অনশন করতে গিয়েছিলেন।

জাফরকে ধরে এনে ব্যবসায় লাগিয়ে দাও, রাজনীতি যখন করে একবার যদি ঢুকিয়ে দেয়া যায় ব্যবসায়, দেখবে তাড়াতাড়িই উন্নতি করছে।

বুঝলাম তো। কিন্তু যে রকম ছেলে, আমার কথা কি শুনবে? শুনুক না শুনুক, চেষ্টা করে তো দেখতে হবে। নিজের মেয়েকে তো আর সাগরে ভাসিয়ে দিতে পারি না।

শরীফ সাহেব আর কথা বললেন না, জাফরকে কি করে রাজনীতি থেকে ফেরানো যায়-দু'চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগলেন তাই। ষাটের কোঠায় তাঁর বয়স। বড়ো ছেলে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হওয়ার পর বেশি রকম ভীতু হয়ে পড়েছেন। শান্তিপ্রিয় লোক বলে দেশের হালচাল দেখে ঘাবড়ে গেছেন একেবারে। বাংলাদেশ হওয়ার পর থেকে আইনশৃঙ্খলা বলতে কিছু আর নেই। বিচার তো নেই-ই। আওয়ামী লীগের চেলাপেলা আর রক্ষীবাহিনীর দাপটে শান্তিপ্রিয় লোকদের পক্ষে শ্বাস নেয়াটাই এখন দুষ্কর।

এগারো অধ্যায়

জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কাকে বলে-হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছে জাফর। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আ. স. ম. রব দু'হাজার টাকা জোগাড় করে জাফরকে বলেছেন নির্বাচনে অংশ নিতে। এক হাজার টাকা জমা দিতে হয়েছে জামানত হিসাবে। কী করে কী করবে এখন, ভেবে কুল পাচ্ছে না।

এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী দল জাসদ। আর কোনো দলই সারাদেশের তিনশ' আসনে প্রার্থী দাঁড় করাতে পারেনি। পাঁচ মাস বয়সের একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বী জাফর। লক্ষ লক্ষ টাকা আর সরকারি মদদপুষ্ট আওয়ামী লীগ প্রতিদ্বন্দ্বী তাদের সর্বশক্তি নিয়ে নির্বাচনে নেমেছেন। রঙ-বেরঙের পোস্টার তাদের, পকেট থেকে এতো টাকা বেরুচ্ছে যে বাংলাদেশকে কিছুতেই মনে হচ্ছে না একটি তলাশূন্য ঝুড়ি। আওয়ামী লীগের ঝুড়ি এত বড়ো যে, নির্বাচনে ক্রমাগত টাকা ঢেলেও তা শূন্য করা যায় না।

লক্ষ লক্ষ চোরাই টাকা বিলাচ্ছে তারা; রেডিও, টেলিভিশন, সরকারি পত্রিকা আওয়ামী লীগের দলীয় প্রচার চালাচ্ছে। রিলিফের কাপড়, কম্বল, গুঁড়ো দুধ এগুলো যা সময়মতো বিলি-বণ্টন করা হয়নি এখন বিলিয়ে নির্বাচনের অনুকূলে কাজে লাগানো হচ্ছে।

জাসদের উপর বাংলাদেশের মেহনতি জনগণের আশীর্বাদ থাকতে পারে, শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বলে আস্থা থাকতে পারে মানুষের। কিন্তু নির্বাচন করতে হলে কিছু টাকার প্রয়োজন পড়বেই এ সমাজ ব্যবস্থায়, যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে দ্বিধা করে না অনেকে। নির্বাচনি খরচ তাদের কাছে ব্যবসায়ে পুঁজি খাটানোর মতো। একবার নির্বাচিত হলেই শতগুণ লাভশুদ্ধ ফেরত আসবে সে টাকা। দলীয় আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রচারই জাসদের নির্বাচনি লক্ষ্য। সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে জাফর। জনসভা, কখনো কর্মীসভা, কখনো নিজ হাতে পোস্টার আর প্রচারপত্র লেখা কাজের কোনো বিরাম নেই তার। ইউনিয়নে ইউনিয়নে, গ্রামে গ্রামে, রাস্তাঘাটে, হাটে-বাজারে সব জায়গায় সে পায়ে হেঁটে হেঁটে গিয়ে সভা করছে।

'ভোটের সদ্ব্যবহার করুন', 'ভোট যেনো কেউ টাকা দিয়ে কিনতে না পারে', 'গরিব কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, জেলে, মাঝি, কামার, কুমার সবাই এক হয়ে দাবি আদায়ের সংগ্রামে প্রস্তুত হোন' 'মশাল মার্কায় ভোট দিন' এসব কথার সাথে সাথে ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ বুঝিয়ে দেয় সে সর্বত্র দিবারাত্র পরিশ্রম করে। পরিশ্রম করে তৃপ্তিও পায়। সে লক্ষ করেছে সঠিক বক্তব্য সহজ কথায় বললে মানুষ তা ধরতে পারে, হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশব্যাপী সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিয়েছে মুজিববাদীরা। চট্টগ্রামের আর. আর. টেক্সটাইল মিলে ঘটেছে এক লোমহর্ষক ঘটনা। ৫ ফেব্রুয়ারিতে সরকারি শ্রমিক সংগঠনের হামলায় সেখানে নিহত হয় পঞ্চাশ জন শ্রমিক, আহতের সংখ্যা

দেড়শ, নিখোঁজ হয় তিনশতের উপরে। দু'দিন পর চট্টগ্রাম আর নোয়াখালীতে হয় হরতাল। সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা দু'শ বলে সংবাদ প্রকাশিত হয় দৈনিক গণকণ্ঠে। মাদারীপুরের জাসদ প্রতিদ্বন্দ্বী অপহরণ-এ সংবাদে চমকে ওঠে জাফর। আর সেদিন বিকেলেই এক জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় জাফরের উপর আক্রমণ চালায় স্থানীয় মুজিববাদীরা। লাঠির আঘাতে ফেটে যায় তার মাথা। ক্রুদ্ধ জাসদ কর্মীরা মোকাবিলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো বাধা দিলো জাফর।

সময়মতো এবং সুযোগমতো পাগলা কুকুরকে শায়েস্তা করবো আমরা, এখন নয়। কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলে সে।

রাতে আর বাড়ি ফেরেনি। ফিরলেই তো মায়ের কান্না শুরু হবে তাকে ঘিরে। পলাশ বাজারে মাথাটা ব্যান্ডেজ করে এক দোকানে বসে আগামী কালের কর্মসূচি কর্মীদের বুঝিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লো। পরদিন ৭ই মার্চ ১৯৭৩ সাল। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের দিন। যে গণতন্ত্র অর্জনের জন্য আট কোটি বাঙালি গত পঁচিশ বছর ধরে সংগ্রাম করে আসছে, স্বাধীন দেশে সেই গণতন্ত্রেরই প্রথম পরীক্ষা আজ। আজকের নির্বাচনের সুষ্ঠুতা আর নিরপেক্ষতাই হবে আগামী দিনের গণতন্ত্র বিচারের মাপকাঠি।

সকাল আটটা থেকেই ভোটদাতারা কেন্দ্রে আসতে শুরু করে। প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে রক্ষী বাহিনী, পুলিশ, আনসার, মোজাহেদ সমন্বয়ে যৌথবাহিনীর সমাবেশ দেখা যায়। বাংলাদেশ রাইফেলস-এর জোয়ানরা টহল দিচ্ছে এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্র পর্যন্ত। ভোট শুরু হয় বেলা ন'টায়। বেলা যতো বাড়ে, উত্তেজনা বাড়ে ততো।

খুব ভোরেই থানা হেড কোয়ার্টারের ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয় জাফর। মাথায় তখনও ব্যান্ডেজ। আগের দিনের কথা স্মরণ করে তাকে দেখে হাসাহাসি করছে মুজিববাদীরা। সাধারণ মানুষ লজ্জায় নত হয়ে তার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে ভিড় করে। যেনো, এ অপরাধ তাদেরই, তাদের জন্যই যতো অত্যাচার মাথা পেতে নিচ্ছে জাফর। জাফর তাদের আশার বাণী শোনায়, স্পষ্ট কণ্ঠে বুঝিয়ে দেয়-এরকম নির্বাচনে কখনো মুক্তি আসে না মানুষের । প্রচুর অর্থ ব্যয় করে যে নির্বাচন করে, সে তার নিজের শ্রেণি ছাড়া গরিব জনগণের জন্য কিছু করে না।

থানা হেড কোয়ার্টারে আওয়ামী লীগের প্রার্থীও গিয়েছিলেন। জাফর পৌঁছেছে তাঁর আগে। আওয়ামী লীগের প্রার্থী এগিয়ে আসতেই রক্ষী বাহিনীর অফিসার এসে করমর্দন করলেন। জাফরকে তিনি চিনতেই চাইলেন না। অথচ এ ভোটকেন্দ্রে জাফরের পক্ষে নিশ্চিত বেশি ভোট পড়বে। অবশ্য এজন্য দুঃখ নেই তার মনে, শুধু অনুমিত বিষয়টির বাস্তব অভিজ্ঞতার স্বাদ পাচ্ছে।

সেখান থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রে চক্কর মেরে পলাশ বাজারে এসে বসলো জাফর। নাশতা খেলো নাশতা খেয়ে যখন বাজার-ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছে বেলা তখন প্রায় দশটা। জাফরকে দেখে কয়েকজন কর্মী ছুটে এলো কাছে। বিভিন্ন কেন্দ্রের সংবাদ নিয়ে এসেছে তারা।

জাফর ভাই, জাফর ভাই, তাড়াতাড়ি চলেন আমাদের কেন্দ্রে। সর্বনাশ হয়ে গেছে।
আরে কি সর্বনাশ হলো, এক এক করে বলো না।
জাফর ভাই, আমি দুই নম্বর কেন্দ্রের পোলিং এজেন্ট। আমাকে মারধর করে কেন্দ্র থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে মুজিববাদী গুন্ডারা। এই দেখুন-
লোকটি গায়ের জামা খুলে পিঠের দাগগুলো দেখাতে লাগলো জাফরকে। জাফর নীরবে তাকিয়ে রইলো খোলা পিঠের উপর লম্বা লম্বা কালচে দাগগুলোর দিকে। এমন সময় আরেকজন বললো-
আমি সাত নম্বরের। রক্ষীবাহিনী কেন্দ্রে ঢুকে সব এজেন্ট বের করে দিয়েছে। নিজেরাই ব্যালট পেপারে নৌকোয় সিল মারছে। আমাদের কেউ আর ভোট দিতে যাচ্ছে না ভয়ে।
তার কথা শেষ হতে না হতেই রক্তমাখা শরীর নিয়ে ছুটে এলো আরেকজন। ভিড় ঠেলে কাছে এসে জাফরকে জড়িয়ে ধরেই অজ্ঞান হয়ে গেলো। জাফর চিনতে পারলো, সে থানা হেড কোয়ার্টার কেন্দ্রের পোলিং এজেন্ট। তাকে ধরে একটা বেঞ্চির উপর শুইয়ে দেয় জাফর। তার চতুর্দিকে তখন কয়েকশ' লোক। সবাই বুঝতে পারে মুজিববাদী পান্ডারা নয়তো রক্ষীবাহিনী পিটিয়ে এই দশা করেছে।

আবারো বুঝানোর পালা জাফরের। কর্মীরা এর প্রতিকার করার অনুমতি চায়, এমনকি গালিগালাজ পর্যন্ত করে অনুমতি না পেয়ে। জাফর তবু স্থির। সবাইকে আবারো পাঠিয়ে দেয় ভোট কেন্দ্রে প্রয়োজনে আবারো মার খেতে। তারপর নিজে রওয়ানা হয় থানার দিকে। সাথে দু-তিনজন কর্মী। কাছাকাছি পৌঁছে গেছে যখন, থানার দিক থেকে আট-দশটা হুন্ডা করে একদল মুজিববাদী পান্ডা আসছিলো। সবাই জাফরকে চিনে। জাফরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেলো সবগুলো হুন্ডা। প্রতি হুন্ডায় দুই কি তিনজন আরোহী। জাফরকে সাইকেল চালিয়ে যেতে দেখে হো হো করে হেসে উঠলো সবাই। সে হাসির স্পষ্ট অর্থ-সাইকেল চালিয়ে পথ চলে যে, সে কখনো জাতীয় পরিষদ সদস্য হতে পারে না।
সামনের হুন্ডার চালক হুন্ডা দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেয়, বাধ্য হয়ে থামতে হয় জাফরকে।
কী জাফর সাহেব, এমন ধেয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?
থানায় যাবো। রিপোর্ট করবো তোমাদের বিরুদ্ধে। এসব গুন্ডামি চলবে না। যান। নালিশ করুন গিয়ে। ব্যঙ্গ করে বললো লোকটি, আর সেই সাথে আবারো হেসে উঠলো সবাই।
দেখো, সাবধান বলছি। বেশি বাড়াবাড়ি করো না। তা হলে-
তাহলে আপনি কচু কাটবেন!
হুন্ডা থেকে নেমে জাফরের সাইকেলের হ্যান্ডেল চেপে ধরে সে।
রাস্তা ছাড়ো বলছি

নইলে আপনি কেঁদে উঠবেন, তাই না? আচ্ছা ছাড়ছি! যান থানায় যান। নালিশ করুন গিয়ে।
পেছন থেকে টিপ্পনি কেটে ধমকে উঠলো একজন-এই বেয়াদব। এমপির সাথে বেয়াদবি করছিস যে! আবারো হেসে ওঠে সবাই। হাসতে হাসতেই
চলে যায়।
রাগে জাফরের ব্যান্ডেজ চুয়ে রক্ত গড়াতে থাকে। যেন ফুটতে ফুটতে উতলে উঠছে তার রক্ত।

সাইকেলে উঠতেই পিছন থেকে ডাক দেয় সাথের এক কর্মী।
জাফর ভাই, দাঁড়ান।
ছেলেটির কণ্ঠে থমকে দাঁড়ালো জাফর। তার মনে হলো-মুজিববাদী পান্ডাদের চেয়েও বড়ো কোনো হুমকি আসছে ছেলেটির কাছ থেকে। বরিশাল কলেজের ছাত্র, ছাত্রলীগের একদম নতুন একজন কর্মী। নতুন হলেও সাচ্চা, তার দৃঢ়তার পরিচয় এ ক'দিনে পেয়েছে জাফর।
কি বলছো সালেহ?
আমি আপনার সাথে যাবো না। এর শোধ যদি নিতে না দেন, আমি কোনোদিন আপনার সাথে থাকবো না।
রাগে ঠকঠক করে কাঁপছিলো সালেহ। জাফর এগিয়ে এসে কাঁধে হাত রাখতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। বললো- আপনি শুধু হুকুম দিন, জাফর ভাই। দেখুন আমরা পারি কিনা।
বলবো। শুধু বলা নয়, করবোও। শুধু এই হিজলা থানায় নয়, সারাদেশেই। গুণে গুণে দাঁত তুলবো আমরা। অপেক্ষা করো।
নিজ হাতে সাত্রে চোখের পানি মুছে দিয়ে জাফর বললো- চলো। শুধু দেখবে আর রেকর্ড রাখবে মনে মনে।
সমস্ত ঘটনা শুনতে চাইলেন না থানার দারোগা। বললেন- আপনি যা জানাতে এসেছেন, তার চেয়ে বেশি জানি আমি। কিন্তু করার কিছু নেই। পুলিশের কোনো ক্ষমতাই নেই। আমাদেরকে শুধু রক্ষীবাহিনী আর আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর আদেশ মানতে আদেশ করা হয়েছে।
কী বলছেন আপনি? উত্তেজিত হয়ে ধমক দিয়ে প্রশ্ন করে জাফর। আমাকে ধমক দেওয়ার অধিকার আপনাদের আছে। কারণ, আপনারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারেন। কিন্তু আমি পারি না। ব্রিটিশ আমল গেলো, পাকিস্তানি আমল গেলো, আজ যা ঘটছে এরকম কাণ্ড আমি কোনোদিন দেখিনি। সত্যের সৈনিক বলে পরিচয় দিই নিজেদের কিন্তু সৈনিকের সাথে সত্যের কোনো যোগাযোগ নেই। আমরা শুধু আদেশ মানার সৈনিক। আমাদের কাছে কিছু আশা করবেন না জাফর সাহেব। কিন্তু জাফরের মনে হলো-এ লোকটিই তাকে যা কিছু আশা দিচ্ছে।

দারোগা সাহেব বললেন-অযথা দৌড়াদৌড়ি না করে শান্ত হয়ে ঠিক করুন গে-কী করবেন? এতো শুধু এক এলাকার নয়, সারা দেশেই। জাতীয়ভাবে কিছু না করলে লাভ হবে না।

এমন সময় ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠলো টেবিলে।
ঝাড়া দশ মিনিট কথা বললেন দারোগা সাহেব। তারপর রিসিভার রেখে গম্ভীর মুখে বললেন-
আপনাদের প্রতি আমার আস্থা আছে। চাকরি হারাবার ঝুঁকি নিয়েও একটি কথা জানাতে চাই আপনাদের যা এইমাত্র জানালাম। ভদ্রতার কারণে নয়, মানবিক কারণেই বিষয়টি গোপন রাখবেন আশা করি। কেননা চাকরি গেলে সংসার চলবে না আমার।
একটুখানি থেমে আবারো বলতে লাগলেন তিনি-
এইমাত্র বরিশাল থেকে এস.পি. সাহেব বললেন-এগারোটার মধ্যে ভোট দান শেষ হয়ে গেছে দেখিয়ে ভোট গ্রহণ বন্ধ করুন। আর সার্কেল অফিসারকে বলে দিন-লোকালী যেনো ঘোষণা করে দেয় যে, আওয়ামী লীগ প্রার্থী বিজয়ী হয়েছে।
এগারোটায় ভোট গ্রহণ বন্ধ হবে! কেনো, ভোট গ্রহণের সময় তো পাঁচটা পর্যন্ত। আর সব ভোটার তো ভোট দেয়নি এখনো! অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করে জাফর।
সব ভোট দেয়া হয়ে গেছে জাফর সাহেব। এখন যারা কেন্দ্রে যাবে, গিয়ে দেখবে-তাদের ভোট ইতোমধ্যে দেয়া হয়ে গেছে।
হো হো করে হেসে উঠেন দারোগা সাহেব। বললেন- আমি এখন উঠি তাহলে।

বারো অধ্যায়

দারোগা সাহেবের কথা ফলে গেলো বেলা বারোটাতেই। হিজলা থানার নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করে দিয়েছেন সার্কেল অফিসার।
জাফরের সহযোগী আর সমর্থকরা বেলা এগারোটায় ভোট গ্রহণ সমাপ্ত ঘোষণা করার সাথে সাথেই ক্ষেপে গিয়েছিলো। কারও নির্দেশ ছাড়াই বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে মিছিল হয়েছে 'মানি না, মানি না, সরকারি ঘোষণা মানি না' বলে। বারোটার সংবাদে কেউ বিমূঢ় হয়নি, এগারোটার ঘটনা ঘটেছিলো বলেই। সকালের দিকে আশা ছিলো তাদের জাফর জিতবে। ভোটারদের মধ্যে সাড়াও ছিলো। রক্ষী বাহিনীর হস্তক্ষেপ মনেপ্রাণে মেনে নেওয়া তাই সম্ভব হয়নি তাদের। বিকেল থেকেই জাফরকে ঘিরে লোকজনের হাজারো জিজ্ঞাসা চলছে। জিজ্ঞাসা চলছে পরস্পরের মধ্যেও-'ভোট দিলাম জাফরকে, জিতলো হাতেমালী? আওয়ামী লীগের প্রার্থীর নাম হাতেম আলী। এলাকার লোকে বলে চোরা হাতেমালী। রিলিফের কম্বল, দুধ চুরির প্রত্যক্ষ সাক্ষী এলাকার অনেকেই।

সরকারি সিদ্ধান্তে ভোটে পরাজিত জাফরকে ঘিরে যত লোক সেদিন পলাশ বাজারে জমায়েত হয়েছিলো, হাতেমালীর বিজয় মিছিলে তার এক- চতুর্থাংশও হয়নি। এ পরাজয় ঘোষণায় হতাশা আসেনি জাফরের মনে, পরিবর্তে মনে জ্বলেছে ক্রোধ। আর ভোট নয়, এবার জনতাকে সত্যিকারের শিক্ষা দিয়ে সংগ্রামের পথে নিয়ে যেতে হবে, মুক্তির আলো দেখাতে হবে তাদের।

এ কল্পনা নিয়েই সেদিন কর্মীদের সাথে আলোচনায় বসে জাফর। আর সমস্ত কিছু কেন্দ্রীয় কমিটিকে জানানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করে সন্ধ্যা বেলায় লঞ্চে করে রওনা দেয় ঢাকার পথে।

বসার মতো জায়গা ছিলো না লঞ্চে কোথাও নির্বাচন করে চাকরিজীবীরা শহরে ফিরে যাচ্ছে, ভিড়ের কারণ এটাই।

এক কোণে দাঁড়াবার জায়গা শুধু করে নিয়েছিলো জাফর। দাঁড়িয়েই কাটিয়েছে সারাটা রাত। সারাদেহে ক্লান্তি, কিন্তু কান দুটো তার খাড়া ছিলো লঞ্চযাত্রীদের আলাপের প্রতি।

ঘাটে ঘাটে থেমেছে লঞ্চ, লোকজন নেমেছে, উঠেছে। উঠেছেই বেশি। ভিড়ের চোটে, প্রথমটায় যেখানে দাঁড়িয়েছিলো জাফর, ঠেলা-ধাক্কা খেতে খেতে কয়েক কদম পিছিয়ে এসে একদম ঠাসাঠাসি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে
লোকজনের ভিড়ে।

লঞ্চযাত্রীদের আলাপের কোনো বিশেষ প্রসঙ্গ থাকে না-এটাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু আজ শুধুমাত্র নির্বাচন নিয়েই কথা বলে চলেছে তারা। কেউ বলছে শোনা কথা, কেউবা স্বচক্ষে দেখা, আবার কেউবা তার নিজের বিশেষ ভূমিকার কথা বলছে।

একমাত্র হিজলা থানা ছাড়া অন্য এলাকার কোনো খবর লঞ্চে ওঠার আগে পায়নি জাফর। লঞ্চযাত্রী একজনের মুখে শুনলো ভোলায় জাসদ প্রার্থী ডাক্তার আজহার উদ্দিনকে রক্ষীবাহিনী আর মুজিববাদীরা এস. ডি. ও সাহেবের সামনে থেকে হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছে। বক্তা নিজেই নাকি ঘটনার সাক্ষী। লোকটি যখন ঘটনার বিবরণ দিচ্ছে, আশেপাশের লোকেরা তখন অবাক হবার ভানও করলো না। প্রত্যেকেই নিজ এলাকার ছোটবড়ো এ রকম ঘটনার বর্ণনা দিতে শুরু করলো। মনে হলো-আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট দিয়েছে এ রকম একটি লোকও যাত্রীদের মধ্যে নেই। সমস্ত যাত্রীই জালিয়াত সরকারের বিরুদ্ধে, নিজ নিজ এলাকায় অত্যাচারিত হয়ে এই লঞ্চে উঠে লঞ্চটাকে যেনো স্বাধীন একটি রাষ্ট্রে পরিণত করে নিয়েছে। জাফর অবাক হয় যে গোপন পরিকল্পনার কথা সে রুবীর চিঠি পড়ে জেনেছে, হিজলা থানার দারোগা মানবিকতার দোহাই দিয়ে যে গোপন কথাটি গোপন রাখতে অনুরোধ করেছেন লঞ্চ যাত্রীদের অনেকেরই তা জানা। একটু আগে একটি লোক চেঁচিয়ে বলছিলো-

আরে ভাই জিতবে না কেনো আওয়ামী লীগ, শেখ মুজিব নিজে ইলেকশন কন্ট্রোল করছে। দেখেন নাই-রক্ষী বাহিনী আর মুজিববাদীরা বিরোধী দলের সমর্থকদের কী রকম হয়রানি করেছে। এসবই শেখ মুজিবের জালিয়াতি।

তার কথা শেষ হতে না হতেই পাশ থেকে অন্য একটি কণ্ঠে শোনা গেলো আরে ভাই রেডিওতে শুনলাম মেজর জলিল, শাহজাহান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন, ডক্টর আলীম আল রাজী এরা অনেক ভোটে অগ্রগামী। তারপর হঠাৎ তাদের সম্পর্কে খবর প্রচার একদম বন্ধ হয়ে গেলো। শুরু হলো শুধু আওয়ামী লীগের জয়ের খবর। কয়েকটা ঘণ্টা পরে শ্রেফ জানিয়ে দিলো তারা প্রত্যেকেই হেরে গেছেন।

বলেই বক্তা তার নিজের প্রশ্ন জুড়ে দিলো কথার সঙ্গে-আচ্ছা ভাই আপনারাই বলুন-এটা একটা কথা হলো? এ যে দিন দুপুরে জোচ্চুরি। লঞ্চযাত্রীদের আলোচনায় অংশ নেয়নি জাফর। অংশ নিতে বাধ্য করতে চেয়েছিলো পাশের লোকটি নির্বাচনকালে রক্ষীবাহিনী আর আওয়ামী মুজিববাদীদের অত্যাচারের কথা যখন উঠেছে, হঠাৎ জাফরের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে উঠলো লোকটি-

আপনাকেও কি মুজিববাদীরা মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে? লোকটির কণ্ঠে খোঁচা মারার ধরনটা ছিলো স্পষ্ট। সম্ভবত আওয়ামী লীগের কোনো কর্মী কিংবা অন্ধ সমর্থক এভাবেই তার নিজের কিছু কথা শুনাতে সুযোগ চেয়েছিলো, অথবা রসিকতার মাধ্যমে চেয়েছিলো জাফরের সাথে ভাব জমাতে। এসময় নীরব থাকা ঠিক নয় ভেবে জাফর বললো- আসলেই তাই।

সাথে সাথে পাশের অন্য একজন জাফরকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে বললো-

এই যে ভাইয়েরা, মেরেছে কিনা এই লোকটিকে দেখুন।

আপনি কোন এলাকার ভাই? প্রশ্ন করলো প্রথম লোকটি। হিজলা থানার।

কোন দল আপনাদের?

জাসদ।

এই দেখেন। চেঁচিয়ে ওঠে পিছনের একজন। বললাম না একটু আগে, জাসদের উপরই আক্রমণ হয়েছে বেশি।

কয়েক জনের পিছন থেকে একটি লম্বা মাথা উঁকি মেরে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলো আপনি কোন এলাকার ভাই?

লোকটি বোধহয় একটু আগের কথা শুনেনি। জাফরকে আর উত্তর দিতে হলো না। পাশের লোকটিই চেঁচিয়ে বলে দিলো উনি হিজলা থানার । লম্বা মাথা দূর থেকে চেঁচিয়ে বললো-হিজলা থানার জাসদ প্রার্থী জাফর সাহেবকে নাকি মারধর করেছে মুজিববাদীরা জিজ্ঞেস করুন তো।

লম্বা মাথার হয়ে পাশের লোকটি কথাটি জিজ্ঞেস করলো জাফরকে। আমিই সেই জাফর। জাফর জবাব দিলো।

সবিস্ময়ে পাশের লোকগুলো ফাঁক হয়ে সরে দাঁড়ালো একটুখানি।

আপনিই জাফর সাহেব!

কেউবা আরো বেশি আপন হয়ে গেলো-জাফর ভাই, আপনি!

মুহূর্তে সবগুলো লোক কাছের মানুষ হয়ে যায়। কেউ কেউ চিৎকার করে গালি শুরু করে দেয় মুজিব সরকারের উদ্দেশ্যে।

মানুষের এই দিব্যদৃষ্টিকে কাজে লাগাতে হবে মনে মনে ভাবে জাফর। পদ্মা- মেঘনার কালো জলের দিকে তাকিয়ে থাকে সে-নদীর বুকে অসংখ্য ছোট ছোট ঢেউ। মার্চের এ সময়ে শান্ত প্রায় নদী। কিন্তু সে জানে ঐ ছোট ছোট শান্ত ঢেউগুলো ঝড়ো হাওয়ার প্রেরণা পেলে ফুলে উঠে দুর্দমনীয় হয়ে গর্জে উঠবে বজ্রের মতো। শো শো রবে আকাশচুম্বী হয়ে দুর্বার গতিতে দানবের মতো ছুটে যাবে। তখন একটি ঢেউ নয়, ঢেউ-এর উপরে ঢেউ, শতো সহস্র ঢেউ সমষ্টিগতভাবে হিংস্র সাপের মতো ফণা তুলে ছুটে যাবে বড়ো বড়ো গাছ আর অট্টালিকা গ্রাস করতে।

আজকের শান্ত জনতাকে ক্ষুদ্র-তুচ্ছ বলে যারা উপেক্ষা করে চলেছে, আগামী দিনে শান্ত জনতার এ রূপ তারা নাও দেখতে পারে। জনতার সাগরে ঢেউ তুলতে বদ্ধপরিকর জাফর। সে জানে-বিপ্লবী সচেতন হাওয়ার ছোঁয়া পেলেই ঝড় উঠবে এ সাগরে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠবে, গর্জে উঠবে দুর্বার শক্তি, সাহস, উত্তেজনা আর উন্মাদনা নিয়ে। সমাজে জাগবে। ঢেউ। প্রচণ্ড ঢেউ। ঢেউ-এর পরে ঢেউ। শতো সহস্র দানবীয় ঢেউ। যে ঢেউরাশি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সমাজের যতো পচা-গলা, দুর্গন্ধময় বিষাক্ত আবর্জনা; তলিয়ে দেবে মহাসমুদ্রে, মুক্ত করবে আবহাওয়া। সে রাতে পদ্মা মেঘনার কালো জলের দিকে তাকিয়ে বার বার শপথ নিয়েছে জাফর।

তেরো অধ্যায়

ছ'মাস পরের কথা। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি চলছে। গ্রীষ্মকাল বিদায়ের পথে। প্রকৃতিতে উত্তাপ কমলেও রাজনৈতিক উত্তাপ কমেনি, সেই সঙ্গে বাজার দরও বাড়ছে ক্রমশ। এরই মধ্যে গ্রামেগঞ্জে অনাহারে মানুষ মরা শুরু হয়েছে। পরনে ছিন্ন বস্ত্র, কিংবা ন্যাংটো অনেক লোকের ভিড় দেখা যাচ্ছে শহরে। এমন শতো শতো লোক নতুন করে আশ্রয় নিচ্ছে রেল স্টেশনে, লঞ্চ টারমিনালে। শহরের রাস্তায় রাস্তায়, এখানে সেখানে কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে শতো সহস্র ছিন্নমূল পরিবার। শ্রমের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কাজ পাচ্ছে না, এ হতাশায় অনেকে ভিক্ষাবৃত্তি নিয়েছে। অবশ্য ভিক্ষে করা কোনো দিনই তাদের পেশা ছিলো না। এ কাজটিকে তারা মনে মনে ঘৃণা করতো। কিন্তু আজ শুধু বাঁচার তাগিদে এ পথে ছুটে আসতে হচ্ছে তাদের। শহরে ও বন্দরের আনাচে-কানাচে রুগ্ন ও ক্লান্ত মানুষের ভিড় ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে তাই তো।

জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট বেতনের চাকরিজীবী আর গরিব লোকেরা মহাবিপদের সম্মুখীন হচ্ছে দিন দিন। স্বাধীনতার আগে যারা মোটামুটি চলতো, তাদের অনেককেই একবেলা উপোস করতে হচ্ছে। নিম্ন বেতনভুক্ত সরকারি কর্মচারীরা অফিস শেষে বিকেলে ও রাতের বেলা রাস্তার পাশে ছোটখাটো চা-পান-বিড়ির দোকান সাজিয়ে কিছু উপরি পয়সা রোজগারের যুদ্ধে লিপ্ত। ভুঁইফোঁড়ের মতো নব্য গজিয়ে ওঠা কিছু সংখ্যক ধনী ছাড়া শহরের অধিকাংশ লোকের পরনেই পাকিস্তানি আমলের পুরানো জামাকাপড়। জোড়াতালির বহর দেখে তাই-ই মনে হয়। অনেকে বাধ্য হয়ে আজকাল ফুটপাতের পুরানো বিদেশি কাপড় কিনছে। অবশ্য দামি কাপড়েরও অভাব নেই বড়ো বড়ো বস্ত্র বিতানগুলোতে। গজিয়ে ওঠা ধনিক শ্রেণি আর সরকারি দলের চেলা চামুণ্ডা ছাড়া আর কেউ যেতে সাহস পায় না সেসব এলাকায়। চোখের সামনে কি দেখতে যে কি হয়ে গেলো তাই ভেবে পাচ্ছে না সাধারণ মানুষ। এ যে মহাবিপদ সংকেত–এ যে মহাদুর্ভিক্ষের লক্ষণ, একজন সামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষেও বুঝতে অসুবিধা হয় না তা।

এ অবস্থায় জনসাধারণ সরকারের বিরুদ্ধে হয়ে উঠেছে প্রতিবাদমুখর। গত ছ'মাসে দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জেলায় গেছে জাফর-সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ হয়েছে। সুযোগ হয়েছে শতো শতো কর্মীদের সাথে ঘরোয়াভাবে আলাপ করার। এ সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করেছে জাফর। কর্মীদের বুঝিয়েছে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা আর সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পার্থক্য। বুঝিয়েছে-জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বিপ্লবের জন্যে একটি সহায়ক শক্তি। বিপ্লবের মূল শক্তি একটি বিপ্লবী পার্টি'যে পার্টি কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের দ্বারা মার্কসবাদ লেনিনবাদের আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। এ রকম পার্টি রাতারাতি গড়ে উঠতে পারে না। ত্যাগ, সততা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সংগ্রামী মেহনতি মানুষকে বেছে

নিতে হবে আর মার্কসবাদ লেনিনবাদের আদর্শের আলোকে প্রস্তুত করে নিতে হবে তাদের।

দলীয় নির্দেশে জাফরের মতো আরো কয়েকজন কর্মী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মীদের সাথে কথা বলতে ভ্রমণে বেরিয়েছিলো। বাস্তব চেতনাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করানোর জন্য চাই প্রচুর পড়াশোনা মার্কসবাদ লেনিনবাদে চাই গভীর জ্ঞান। এ কথাটিই তারা বুঝিয়েছেন যেখানে গেছেন সেখানেই।

এ ভ্রমণ বেশ কাজে লেগেছে তাদের। কর্মীদের মধ্যে বেড়েছে পড়াশোনার আগ্রহ। ঢাকা শহরের কয়েকটি পরিচিত দোকানে এখন বিশেষ কিছু বইপত্রের খোঁজ নিতে দেখা যাচ্ছে নিয়মিত।

আজও দুপুরে ঢাকা স্টেডিয়ামের উপরে স্ট্যান্ডার্ড আর প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরিতে কর্মীদের ভিড় দেখেছে জাফর। বাংলাবাজারের চলন্তিকা বুকস্টলেও কিছু কর্মীর আনাগোনা লক্ষ করেছে। এরপর মনের আনন্দে হেঁটেই আসছিলো সে গুলিস্তানের দিকে। হঠাৎ তার চোখে পড়লো এক ছত্র দেয়াল লেখন-এর প্রতি-"হারামজাদা ভাত দে।" জাফর লেখাটুকুর সামনে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। নিবিড় দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো সত্যি অপূর্ব হয়েছে! এ ধরনের লেখা জাফর আগে দেখেনি! অল্প কথায় কতো বাস্তব দিক তুলে ধরা হয়েছে। হারামজাদা ভাত দে কতো সহজে মৌলিক দাবি তুলে ধরা হয়েছে। কথাটির পিছনে যে কতো ক্ষুধা লুকিয়ে রয়েছে কে জানে। এবারে তার খেয়াল চাপলো দেয়ালের লেখাগুলো ছোট্ট নোট বইটিতে লিখে রাখবে সে। পকেট থেকে কলম বের করে লেখা শুরু করলো- 'হারামজাদা ভাত দে', 'ছেলেহারা মায়ের ডাক, মুজিববাদ নিপাত যাক।' 'মুজিববাদের গদিতে আগুন জ্বালো একসাথে। শেখ মুজিবের গদিতে আগুন জ্বালো এক সাথে। 'মারবো লাথি খোঁড়া রাষ্ট্রপতির লাল ঘোড়া।' 'খুনি মুজিবের বিচার চাই।' মণি, মুজিব, মুজাফফর, বাংলার মীরজাফর।' 'দালাল আইন বাতিল করো।" 'পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের ফিরিয়ে আনো।' 'মুজিব যদি বাঁচতে চাও, বাংলা ছেড়ে চলে যাও।' 'সংগ্রাম সংগ্রাম, শ্রেণি সংগ্রাম।' 'বিপ্লব বিপ্লব, সামাজিক বিপ্লব।' 'লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও।' 'খুনী রক্ষীবাহিনীর বিচার চাই' 'ভারতের দালালি চলবে না।' 'রুশ ভারত চুক্তি বাতিল করো,' 'এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াইয়ে জিততে হবে।' 'এম. এ. আওয়াল বহুল আমিনসহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তি চাই।'

জাফর ধীরে ধীরে হাঁটলো আর দেয়ালের লেখাগুলো একমনে নোট করতে লাগলো। কিছুদূরে অগ্রসর হওয়ার পরে দেখলো সবগুলো কথা তার ছোট্ট নোট বুকে জায়গা হবে না কিছুতেই। এ যে ভাষা আর বক্তব্যের ছড়াছড়ি-এ যে বিশাল। কোনো দেয়াল খালি নেই, সবগুলোতেই কিছু না কিছু লেখা। অসম্ভব! এসব কারও পক্ষে লিখে শেষ করা যাবে না। নোট বই আর কলম পকেটে পুরে রাখে জাফর। এবারে চড়লো

রিকশায় এবং মনে মনে ঠিক করলো সারা বিকেল রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক এবং অলিতে গলিতে ঘুরবে সে। ঘুরে ঘুরে রাজধানীর দেয়ালগুলোর লেখা দেখবে। তাই রিকশা- ওয়ালাকে বললো-

চলো ভাই।

কোথায় সাব?

চলো, চলতে থাকো, যেখানে ইচ্ছে সেখানে।

সাব ঠিক কইরা কন কই যাবেন। বলে রিকশাওয়ালা জাফরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নেয়। কথা শুনে জাফরকে পাগল বলেই ধরে নিয়েছে সে। আরে চলো একদিকে-অন্যমনস্কভাবে জবাব দেয় জাফর, আর ঘুরে তাকাতে থাকে দেয়ালের দিকে।

সাব মাথা ঠিক আছে তো?

হুঁ কি বললে? ওহ! মাথা? না না রোদের ভয় নেই, তুমি চলো রাস্তার দেয়ালের দিকে ফিরেই জাফর জবাব দেয়।

পাগলই তো মনে হয়। এবার রিকশাওয়ালা জোরে চেঁচিয়ে ওঠে-

আরে সাব কি নতুন আইলেন নাহি শহরে? ঠিকানা ভুলছেন মনে লয়।

জাফর দেয়াল দেখায় এতো ব্যস্ত হয়ে পড়লো যে, রিকশাওয়ালার কথা তার কানেও গেলো না। রাজধানীর দেয়ালগুলো আজ তার কাছে অভিনব লাগছে। এতো স্লোগান থাকে দেয়ালগুলোতে তা সে কখনো লক্ষ করেনি লেখাগুলো পড়তে বড়ো ভালো লাগছে তার। লেখাগুলোয় প্রাণ আছে, সত্য আছে, প্রশ্ন আছে, আবেগ আছে, ঘৃণা আছে, আছে সতর্কবাণী, আছে দাবি স্বাধীন-তারপর গত একুশটি মাস ধরে ওগুলো লেখা হচ্ছে। জাফর ভাবলো দেয়ালের ও লেখাগুলোই তো বর্তমান সময়ের চিৎকার আর ইতিহাসের টোকা।

দেয়ালের লেখাগুলো সত্যিই কেউ পড়ে কোনদিন, না এমনিই আবেগের অপচয় ঘটে? যদি সত্যিই পড়ে, তাহলে শাসকগোষ্ঠী কেনো তাদের ভুল শোধরাতে পারে না ওগুলো দেখে।

দেয়ালের লেখাগুলো নিছক অর্থহীন বা আবেগহীন নয়, ওগুলোর মাঝে ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে আছে ওগুলো জনতার আবেগ, অনুভূতি, উপলব্ধি ও স্বপ্নের বহিঃপ্রকাশ।

হঠাৎ একজায়গায় এসে রিকশা থেমে গেলো, নিউমার্কেটের উঁচু দেয়ালের লেখন দেখায় ডুবে গেলো জাফর।

রিকশাওয়ালা কিছুক্ষণ থমকে থেকে বললো-

সাব, কই যাইবেন কইলেন না? না কইলে যাইতে পারুম না।

এতোক্ষণে জাফরের হুঁশ ফেরে। রিকশা দাঁড় করানো দেখে একরকম অবাক হয়েই বলে,

থামলে কেনো চলো?

আমি পারুম না সাব, আমারে বিদায় দেন। আপনি কই যাইবেন কর্ণনা কিছু।
আরে! মহামুশকিল তো? আচ্ছা কতো দিতে হবে অন্যমনস্কভাবেই জিজ্ঞেস করে জাফর।
দেন আপনের যা মর্জি সাব। বলেই রিকশাওয়ালা কাশতে কাশতে বমি করা শুরু করলো।
এবারে জাফর বুড়ো রিকশাওয়ালার দিকে নজর দেয়। লোকটি তার বাবার বয়সেরই, খুব রোগা। ক্লান্তির জন্যই বমি করে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি সিট থেকে নেমে রিকশাওয়ালাকে ধরলো জাফর। সে তখনও বমি করছে। তবু কথা বলার চেষ্টা করে। ছাড়েন সাব আপনার কাপড়-চোপড় খারাপ অইয়া যাইবো।

না, না তাতে কি? আমারই ভুল হয়েছে আপনাকে এতোক্ষণ ঘুরিয়ে। মনে মনে লজ্জিত হয় জাফর।
না, সাব আপনার কসুর কি? আমরা গরিব, আমাদেরই কসুর। কাম না করলে খাইমু কী?
থাক আপনি কথা বলবেন না, আবার বমি শুরু হতে পারে।
পিছনে একটা গাড়ির হর্ন শোন গেলো। হর্ন বাজছে তো বাজছেই, থামছে না। ব্যাপারটা দেখার জন্য জাফর পিছনে তাকাতেই দেখে বাবুলকে। বাবুল একটা টয়োটা গাড়িতে বসে ড্রাইভ করছে। সেই সঙ্গে হর্ন বাজাচ্ছে আর হাসছে। বাবুলের এ ধরনের আচরণ ভালো লাগলো না জাফরের। সে একবার দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলো, আর রিকশাওয়ালাকে ধরে মাটিতে বসিয়ে দিলো। ততোক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে বাবুল জাফরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।
কি রে এখানে আবার কী হচ্ছে? কতো আর মরা বাঁচাবি বন্ধু। মানুষ তো রোজই মরছে এভাবে। কী হয়েছে লোকটার?
আমি এ রিকশায় ঘণ্টাখানেক ঘোরার পরে এখানে এসে দাঁড়াতেই রিক্সাওয়ালা বমি করতে শুরু করলো।
তার তুই কী করবি? ভাড়া দিয়েছিস তো ছেড়ে দে, বললো বাবুল।
না ভাড়া দিইনি এখনো, তাছাড়া এভাবে লোকটাকে ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না।
না সাব, আপনি যান আমি ঠিক অইয়া যামু, আপনি আর কী করবেন। আমার যে দুঃখের কপাল বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ালো।
পারবেন তো যেতে, না আপনাকে মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছে দেবো, চিন্তিত হয়ে বলে জাফর।
না সাব মেডিক্যাল কলেজে গিয়া কি করমু-ঐটাতে কি ভর্তি হইতে পারি আমরা? ভর্তি অইলে দশ বারোজনের সংসার চলবো কেমনে? এই চিন্তায়ই তো অস্থির থাকি সাব। রোজ সকালে কিছু নাস্তা খাইয়া আসি। সারাদিন রিকশা চালাই, দুপুরে একটা রুটি

খাইয়া চা খাই। বাসায় গিয়া ভাত খাই হেই রাইত দশটায়। বমি রোজই দুই একবার অয়, কি জানি অইছে শরীলডার? বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়ো রিকশাওয়ালা।
নিজেকে দোষী করলো জাফর মনে মনে। মনের খেয়ালে বুড়ো লোকটাকে এতোক্ষণ ঘুরানোর জন্যেই বুঝি এ রকম কাণ্ড ঘটলো। পকেটে বিশটি টাকা আছে-সবটাই বুড়োকে দেবে বলে মনে মনে ঠিক করলো। কিন্তু টাকা বের করতে পকেটে হাত দিয়েই থমকে গেলো। মানিব্যাগটিই নেই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সে। কি কৈফিয়ত দেবে এখন রিকশাওয়ালাকে?
বাবুল বললো কি হয়েছে রে? অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে। দে, রিকশাওয়ালাকে বিদায় করে দে। তারপর চল আমার সঙ্গে।
আমার মানিব্যাগ চুরি হয়ে গেছে।
আপনারে সাব পরথমেই পাগল বইলা মনে অইছিলো আমার। দেহেন তো সাব আমার একটা ঘণ্টার মেহনত এহন বলে বাবুলের দিকে এমনভাবে তাকালো রিকশাওয়ালাটি যেনো বাবুলই এখন বিচার করে দেখুক ব্যাপারটি।
আহা। অস্থির হয়ো না, আমি দিচ্ছি। বলে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে দশ টাকার একটি নোট গুঁজে দিলো বুড়োর হাতে।
ঠিক আছে। লজ্জা এড়াতে তাড়াতাড়ি বললো জাফর।তুমি দিয়ে দাও, আমি শোধ করে দেবো পরে।
বাবুলের কাছ থেকে এ রকম সহযোগিতা নিতে মনে মনে দারুণ লজ্জিত জাফর। একবার ভেবেছে-রিকশা করেই হলে চলে যাবে, কারও কাছ থেকে ধার করবে টাকা। কিন্তু রিকশাওয়ালা তাকে যে রকম জ্ঞান করছে- নিশ্চয়ই আর যেতে চাইবে না। শুরু থেকে তার আচরণ পাগলের মতো ছিলো- রিকশায় চড়ার সময় এ রকম চিন্তা না করলেও এখন সে তা বুঝতে পারছে। এতোক্ষণ রিকশায় চেপে হাঁ করে রাজধানীর দেয়ালের লিখন সে পড়েছে-এ কথা কাউকে বললে সে-ও তো তাকে পাগলই ভাববে। দেয়ালের লিখন পড়তেই রিকশায় চাপা এ যে সম্পূর্ণ নতুন কথা। কিন্তু নতুন কথা হলেও জাফরের কাছে এ ক্ষণিকের অভিযান দারুণ অর্থবহ। উত্তেজনাপূর্ণও। রাজধানীকে সে দেখেছে আজ নতুন করে। দেয়ালগুলো যেনো আর দেয়াল নয়, এ যেনো ইতিহাসের পাতা। সমাজ সভ্যতাকে ডেকে বলছে-'আমাদের পাঠ করো। পাঠ করো তোমাদের অবস্থা ও অবস্থানকে।'
বাবুল বললো-কিরে দাঁড়িয়ে রইলি যে, চল না এখন।
কোথায় যাবো?
চল, আজ চারটেয় আমাদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অফিসে জরুরি কর্মীসভা আছে, চীফের সাথে আলাপ করিয়ে দেবো তোকে।
না, না। অন্য কাজ আছে আমার। তাছাড়া ওতো তোদের কর্মীদের সভা।

তাতে দোষ নেই, আমার সাথে যাচ্ছিস, বাস! চল যাই। দেখি তোর ভাগ্যটাকে বদলাতে পারি কিনা। কি যে চেহারা বানিয়েছিস। একদম সৎ মানুষের মতো পাগল কিংবা পাগলের মতো সৎ মানুষ। এখন বলতো কোথায় ছিলি এতোদিন? সেই যে ইন্টারকন থেকে পালিয়ে গেলি আর তোর দেখা নেই।

দেশের বাড়ি গিয়েছিলাম।

চাচা-চাচিমা কেমন আছেরে?

বাবার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। অসুখের খবর পেয়েই গিয়েছিলাম। এখন মোটামুটি ভালো।

জাফরের ভরসা হচ্ছে বাবুল কিছুতেই ধারণা করতে পারবে না যে, রাজনীতির সাথে এতো ঘনিষ্ঠভাবে সে জড়িত।

ওঠ গাড়িতে। সময় হয়ে গেলো মিটিং-এর। বলতে বলতে টেনে নিয়ে গাড়িতে চড়ালো জাফরকে। আপত্তি জানালো না জাফর, বরং উৎসাহ জাগলো স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মিটিং কেমন হয় তা দেখার জন্য।

নিউ মার্কেটের ভিড় চিড়ে গাড়ি ড্রাইভ করে চলে বাবুল। পাশে বসে অস্বস্তিবোধ করলেও জাফর বসে থাকে নিজেকে সংযত রেখে। কারণ, তার উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত স্বার্থের অনেক উর্ধ্বে।

চৌদ্দ অধ্যায়

রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে এক হোটেলে ঢুকে কিছু নাস্তা করে দু'জন। তারপর সোজা চলে যায় আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অফিসে। সেখানে পৌঁছে জানা গেলো সে মিটিংটি অনুষ্ঠিত হবে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে।

দেরী করলো না বাবুল। সোজা গাড়ি চালালো তোপখানা রোডের দিকে। শাহবাগের কাছাকাছি এসে বাবুল বললো-জাফু তুই কোথায় যে এক একবার ডুব দিস, একদম হদিস পাওয়া যায় না। সারাদিন শহর জুড়ে গাড়ি চালাই, একদিন সামনে পরিসনে।

শুনে মনে মনে হাসে জাফর। বাবুল যেনো ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেস করছে না। সে কোথায় থাকে।

বাবুল বললো ঢাকায় কোথায় থাকিস, আর ঠিকানা যে নেবো, লাভ কি নিয়ে। এতো ব্যস্ততার মধ্যে তো দেখা করার সময়ও পাবো না।

শুনে আরেক প্রস্থ হাসে জাফর।

এদিকে খবর কিরে? মুচকি হেসে শুধায় বাবুল

কী খবর? কিসের?

কী খবর! লক্ষ্মীটি, কিছুই বুঝি জানো না তুমি। জাফরের নাক ধরে নাড়া দেয় বাবুল।

খতমত খায় জাফর। বাবুল কি জাফরের সব ব্যাপার জানে তাহলে? তবু সাহসভরে জিজ্ঞেস করে সে- কিসের খবর রে?

হ্যাঁ! তুই দেখছি কিছুই খবর রাখিসনে! সেদিন ইন্টারকন থেকে যে অমনি চলে এলি, তারপরে সব ঝামেলা পড়লো আমার ঘাড়ে। আমাকে এসে বললো আপনার সাথের ভদ্রলোকে হঠাৎ করে বেরিয়ে গেলেন কেনো? কোথায় থাকেন তিনি বলতে পারেন?"

আহহা কি সুন্দর রাজকুমারী। কার কথা বলছিস?

কার কথা আর বলবো। বলছি সেই মন্ত্রী নন্দিনীর কথা, যে তোকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছিলো। ওর মনে কি করে ঢুকলি রে, ওতো বড্ড শক্ত মেয়ে।

তা তুই কি করে জানলি? চিনিস নাকি? তার মনের সন্দেহ সঠিক হোক রকম বুক-ভাঙ্গা আশাতেই জিজ্ঞেস করলো জাফর।

চিনি বৈ কি? তা তুই কবে থেকে লেগেছিস ওর পিছনে। কে লেগেছে কার পিছনে! ক্ষেপে যায় জাফর। কি বলছিস এসব । ছিঃ ছিঃ। আমি তোর সাথে যাচ্ছিনে, নামিয়ে দে এখানেই। আরে রাগ করছিস কেনো? ঠিক আছে, দুই বন্ধু মিলে না হয় এনজয় করবো মন্ত্রী নন্দিনীকে।

কি সব যা তা বলছিস। এতো বাজে হয়ে গেছিস তুই! আর কেইবা তোর মন্ত্রীর মেয়ে? ক্রোধ আর বিস্ময়ের সম্মিলিত সুর জাফরের কণ্ঠে।

আমি ঠিকই বলছি। ওকে কে না চেনে? থাক থাক। খুব চিনেছো। ঢের হয়েছে, আর বলতে হবে না। চোখেমুখে আর কণ্ঠে চরম বিরক্তি এনে ধমকে ওঠে জাফর।

চটিস কেনো? তোর মাথা কি ঠিক নেই? আচ্ছা নে থাক। কিন্তু বল-তোর ঠিকানা চায় আমার সাথে দেখা হলেই। বলতো কি বলবো তাকে? কিছু মাথায় ঢুকছে না। তুই গাড়িতে বসেই লুকিয়ে নেশা করিসনি তো ড্রাইভ করতে করতে? নাকি সে নেশার ঘোরে থাকলেই আমার ঠিকানার কথা জিজ্ঞেস করে তোকে?

জাফরের মন বলছে-বাবুলের কথা যদি সত্যি হয়, তবে নেশাগ্রস্ত হয়েই অমন আবোল-তাবোল বলে থাকবে রুবী।

আমিও বুঝতে পাচ্ছি না কিছু। নাকি সিটের নিচে যে জনি-ওয়াকারের বোতল রেখেছি তা সাবাড় করে দিয়েছিস এতোক্ষণে। ঠিক আছে, প্রলাপ বকিস পরে। এই যে এসে গেছি। বলতে বলতে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে গাড়ি থামিয়ে দিলো বাবুল।

অফিসের সামনে তরুণ আর যুবকদের ভিড়। সবাই পরেছে বিদেশি দামি কাপড়ের বেলবটম প্যান্ট, গায়ে রঙ-বেরঙ-এর বুশ শার্ট, টি-শার্ট, কোমরে চওড়া কায়দার বেল্ট। অধিকাংশের চোখেই কালো গগলস। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। কারো মুখে ইয়া বড়ো গোঁফ, কারো মুখে দাড়ি গোঁফ দুটোই; কিছু সংখ্যক দাড়ি-গোঁফবিহীনও দেখা যাচ্ছিলো।

এদের বয়স আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যে, বেশ কয়েকজনের হাতে পয়েন্ট থ্রি টু কেলিবারের স্পেনিশ পিস্তল, এমনভাবে নড়াচড়া করছে দেখলে মনে হবে। শিশুদের হাতে খেলনা বৈ ও কিছু নয়।
গাড়ি পার্ক করে জাফরকে নিয়ে অফিসের দিকে আসতেই অফিসের বাইরে দাঁড়ানো যুবকদের মধ্যে সহসা একটা হৈ-হুল্লোড় অট্ট-হাসির রোল পড়ে গেলো। বাবুল আর জাফর এগিয়ে কাছে যেতেই একজন বললো কোত্থেকে ধরে আনলে বাবুল এই মজনুকে?

আমার এক বন্ধু। তোদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো বলে নিয়ে এলাম। উত্তর দিলো বাবুল। জাফর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।
বেশ, ডেসপ্যারেট বলেই তো মনে হচ্ছে। কিছু ট্রেনিং নিলেই পারবে মনে হয়।
জায়গাটি থেকে বিশ্রী এক ধরনের গন্ধ বেরুচ্ছিলো। যুবকদের সারা গা থেকে বেরুচ্ছে সেন্টের গন্ধ, মুখ থেকে মদের গন্ধ। তীব্রতা বেশি দ্বিতীয়টির। বমি এসে যাচ্ছিলো জাফরের, অনেক কষ্টে সংযত করলো নিজেকে-এদের পেটের খবর নেবেই নেবে সে। এ লোকগুলোর কেউই জাফরকে ভালো করে চেনে না। এর কারণও আছে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বিশিষ্ট সদস্য হলেও যা কিছু সে করে সব কিছুই গোপনে, বিপ্লবী কাজ করাকেই পছন্দ করে সে বেশি। এজন্য তার সাথিরাও ঠাট্টা করে থাকে। প্রকাশ্য কোনো দলীয় কাজে বড়ো একটা সে থাকে না। তাই অনেকে জানে না তার আসল রূপ। তাঁর পুরানো বন্ধুদের মধ্যে এখন যারা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ কিংবা অন্য বাহিনীর সঙ্গে জড়িত তারা জানে জাফর রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছে। এরকম ভেবেই বাবুল আজ জাফরকে টেনে নিয়ে এসেছে একটা না একটা কাজ জোগাড় করে দেবে বলে। কিন্তু বাবুল এখনও টের পাচ্ছে না তার সেই আগেকার বন্ধু জাফর আর সেই জাফর নেই। জাফর আর নেই তার বন্ধু, জাফর একজন বিপ্লবী এখন।
সভা শুরু হলো খানিক বাদেই। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধানের ঘোষণা থেকে বুঝা গেলো এ সভাটি হচ্ছে ঢাকা শহর যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কর্মীদের যৌথ সভা। সভা শুরু করার আগে বাহিনী চীফ বসতে বললেন সবাইকে। বাবুল জাফরকে সামনের সারিতে টেনে নিয়ে যেতে চাইলেও পিছনে একটা চেয়ারে বসে গেলো। কর্মীদের কেউ বসলো, কেউ দাঁড়িয়েই রইলো। শৃঙ্খলার নাম গন্ধ পাওয়া গেলো না সভার বাহিনী চীফ সভা শুরু করলেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জন্য জয়ের মালা এনে দিয়েছে বলে উপস্থিত সমস্ত কর্মীদের শুভেচ্ছা জানালেন, তারপর বললেন-বস তোমাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু মোকাবিলা এখানেই শেষ নয়। বিরোধী দলীয় শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কলেজ-ভার্সিটির নির্বাচনে জয়ী হচ্ছে তারাই। আমাকে জানিয়েছেন 'বস'-"তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে মুক্তি যুদ্ধ করেছো" এখন "যা কিছু লাগে তোমাদের দেওয়া হবে বিরোধী দল প্রধানত জাসদের শক্তি খর্ব করতে হবে। কলেজ-ভার্সিটি কোথাও অন্য কাউকে জিততে দেওয়া চলবে

না। এজন্য যা কিছু হাতের কাছে দরকার তার জন্য সরাসরি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

এটুকু বলতেই স্লোগান শুরু হয়ে গেলো খুশিতে-"বঙ্গবন্ধু যেখানে, আমরা আছি সেখানে।" "তোমারে বাদ আমার বাদ মুজিববাদ মুজিববাদ।" স্লোগানের মধ্যে বাহিনী চীফের কণ্ঠ শোনা গেলো কয়েকদিনের মধ্যেই সারা বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সকল আঞ্চলিক চীফ, যুবলীগ চীফ, ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ বাহিনী এবং স্পেশাল স্কোয়াডের চীফদের নিয়ে গণভবনে বসের দরবারে মিটিং হবে। আজ থেকে ঢাকা শহরে চারখানা সাদা জিপ চলবে। প্রত্যেকটিতে থাকবে ওয়ারলেস সেট। স্পেশাল স্কোয়াডের এ জিপগুলোতে বোঝাই থাকবে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। উপস্থিত সমস্ত কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে স্পেশাল বাহিনীর কর্তব্যে সহযোগিতা করতে। সভা শেষ হলো বেশ দেরিতে। হলরুম থেকে বাইরে বেরিয়ে বাবুলকে না খুঁজেই চলে এলো জাফর। এ নিয়ে কিছু ভাবে না জাফর। বাবুল তাকে আধপাগলা আভোলা বলে জানে। বাহিনী চীফের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য হয়তো এদিক ওদিক খুঁজবে কতোক্ষণ। তারপর আবার হয়তো রাস্তায় দেখা হয়ে যাবে একদিন। এরকম ভেবে সান্ত্বনা খুঁজবে মদ খেতে খেতে। জাফর বারবার ভাবছিলো এই স্পেশাল স্কোয়াডটির কথা। এদের বিষয়ে পুরাপুরি জানতে চায় সে। একবার মনে হলো বাবুলকে ছেড়ে এসে ভুল করেছে। অনেক দূর থেকে প্রসঙ্গ তুলছে বাবুল নিজে থেকেই এ নিয়ে হয়তো আরো কিছু বলতো।

আর কার কাছে জানা যায়। সহসা তার মনে পড়ে রুবীর কথা। নির্বাচন উপলক্ষ্যে সে যখন হিজলায় রুবীর একটা চিঠি পেয়েছিলো। চিঠি নয় কিছু গোপন খবর। নিচে রুবীর নাম লেখা না থাকলে উড়ো খবর বলে ধরে নিতো জাফর। নির্বাচনে সরকারি পক্ষের ষড়যন্ত্র চলবে এ সন্দেহ তার ছিলো। কিন্তু রুবীই তাকে স্পষ্ট জানিয়েছিলো। আর সে খবর কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছিলো লোক পাঠিয়ে। কেবল সূত্রটি জানায়নি তখন।

এসব গোপন সংবাদ রুবী পেলো কোত্থেকে? পরক্ষণেই বুঝতে পারলো মুজিববাদীদের সাথে যখন তার ওঠাবসা, এ রকম গোপন তথ্য জানা অসম্ভব নয় তার পক্ষে।

দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে জাফর। বাবুল যখন বলেছিলো ও বড্ড শক্ত মেয়ে খুশি হয়েছিলো মনে মনে। কিন্তু ঐ মাতাল বদমাইশদের সাথে তার ওঠাবসা-এ কথা ভাবতেই গা ঘিন ঘিন করে ওঠে।

সে কি একবার যাবে রুবীদের বাসায়? ওর কাছে নতুন কোনো তথ্য যদি থাকে, স্পেশাল স্কোয়াড সম্পর্কে কিছু যদি জানা যায়।

সাত পাঁচ ভেবে যাবেই ঠিক করলো।

পনেরো অধ্যায়

রাত তখন দশটা। ছ'মাসের মধ্যে আজ এই তৃতীয় বারের মতো জাফর এলো রুবীদের বাড়িতে। এসেছে রুবীর সাথে শেষবারের মতো একটা বোঝাপড়া করতে। কিংবা নিজের ইচ্ছে মতোই থাকুক রুবী, শুধু গণমানুষের স্বার্থে কিছু সহযোগিতা করুক জাফরকে- এ অনুরোধটি জানাতে।

ছ'মাসে মোট চারবার দেখা হয়েছে রুবীর সাথে। দু'বার এ বাড়িতে দু'বার রাস্তায়। যখন ভার্সিটিতে যাচ্ছিলো। রুবী রিকশা করে। কথা হয়েছে পরদিন রাতে। এ দু'দিন রুবীদের বাড়িতেই কাটিয়েছে জাফর।

দেশের বাড়ি থেকে ফেরার দিন নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করতে করতে রুবীর মা হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন-তোমার মাথায় কি হয়েছে বাবা? কেটে গেছে। মিটিং-এ আক্রমণ চালিয়েছিলো মুজিববাদীরা।

আর্তনাদ করে উঠেছিলেন রুবীর মা। রুবী ছিলো অদূরে, অশ্রুসজল চোখে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

রুবীরা মা বলেছেন- দেখো বাবা, এখন তুমি ছাড়া আমার আর কোনো ছেলে নেই। তুমিই সব আশা-ভরসা আমাদের। তোমার মায়ের চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। আমরা আশা করছি রুবীর পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই শুভ কাজটা সেরে ফেলবো। আমার একটা অনুরোধ রাখো তুমি-রাজনীতি করা ছেড়ে দাও।

রুবীর বাবাও ঐ একই অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

মুখে হাসি ফুটিয়ে জাফর বলেছে "এ ব্যাপারে রুবী কি বলে, মামীমা?" জিজ্ঞেস করে দেখো তুমি নিজেই।

যার যা ইচ্ছে, আমি কি বলবো আবার।

রুবীর কণ্ঠে জেদ। ইন্টারকনে যে অবস্থায় তাকে দেখেছে রুবী, "যার যা ইচ্ছে" কথাটি দিয়ে সব কিছু গেঁথে একসাথে প্রকাশ করছে রুবী-ভাবে

জাফর যা খুশি ভাবো। মনে মনে বললো জাফর। কিন্তু তুমি যে ওখানে কেনো গিয়েছিলে, আর নিয়মিত যাও-তা কি ইচ্ছের স্বাধীনতায় নয়? কথাগুলো বলতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু বলা হয়নি। জাফর ভাবে, এ তো সেই প্রাইভেট প্রপার্টি মেন্টাল কমপ্লেকস, নিজে খারাপ হতে পারি। তোমার খারাপ হওয়া চলবে না।

আমার বিশ্বাস-রুবী চায় আমি রাজনীতি করি। দৃঢ়কণ্ঠে বললো জাফর। তার বিশ্বাসের উৎস রুবীর দেওয়া ঐ চিঠি। সরকারের গোপন পরিকল্পনা তাকে। জানিয়ে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে রাজনীতিতে তাকে উৎসাহ দেওয়া, সহযোগিতা করা।

জাফরের দিকে তৃপ্তি ভরে তাকিয়ে থাকে রুবী। মনে মনে বলে- তোমার বিশ্বাসকে আমি সত্যে পরিণত করবো। তোমার সাথী হয়ে থাকবো চিরদিন।

সালমা বেগম দ্রুত তাকিয়ে ছিলেন মেয়ের দিকে। মনেপ্রাণে চাইছিলেন জবাব না দিক রুবী, চোখেমুখে 'না' কথাটি ফুটিয়ে তুলুক শুধু। কিন্তু কোনো লক্ষণ দেখলেন না

তার। বললেন-তোমাদের ছেলেমানুষী আমাদের বড়ো চিন্তিত করে তুলছে। দুজনে মিলেই না হয় ভেবে নিয়ো বিষয়টি। তারপর ইচ্ছে করেই যেনো অন্য ঘরে চলে গেলেন তিনি। আর তিনি চলে যেতেই একবার দরজার দিকে তাকিয়ে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এসেছিলো রুবী। বলেছিলো-কেমন ছিলেন, জাফর ভাই?

অথচ জাফর আশা করেছিলো প্রশ্নটি অন্তত হবে-কেমন আছেন জাফর ভাই?

জাফর বললো-কেনো? তোমার কষ্ট হয়েছে, নাকি?

স্পষ্টভাবেই শ্লেষের সুরটি শুনতে পেলো রুবী। জ্বলে উঠলো সাথে সাথে। না। আমার তা হবে কেনো? আপনার কতো বান্ধবী, তাদের হতে পারে। জবাব দিলো সে।

একরাশ পানি এসে গেলো তার চোখে, তবু সে তাকিয়ে রইলো জাফরের প্রতি। চাইলো-জাফর তার বিগন্ধ আকে জানুক চিনুক জাফর বুঝুক তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে, রোজী নয়।

রুবীই রুবীর কথায় ফল হলো উল্টো। নির্বাচনের পরে বাড়ি থেকে যে মন নিয়ে এ বাড়িতে এসেছে জাফর, রুবীর খোঁচামারা কথায় খান খান হয়ে ভেঙে গেলো সে মনটি। বাড়িতে তার মাকে পূর্ণ সম্মতি না জানালেও রুবীর সাথে বিয়েতে সম্মতিই ছিলো তার। ভেবেছিলো রুবী তাকে সাদরে বরণ করবে, খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারবে দুজন। কিন্তু একি হলো রুবীর! রুবীর কথা। বুঝতে না পেরে সবিস্ময়ে সেদিন জিজ্ঞেস করেছে জাফর- কোন বান্ধবীর কথা বলছো তুমি?

শিশুটি সাজতে হবে না আমার কাছে । সব জানি, সব শুনেছি। কি সব যে বলছে রুবী? তোমার মাথা ঠিক আছে তো।

খুব ঠিক আছে বরং আপনারটাই খারাপ রয়েছে রোজীর পিছনে।

অবাক হয় জাফর।

কোন রোজী? কে রোজী?

সে তো আপনিই ভালো জানবেন। যান যান, তার কাছে যান। আমার কোনো আপত্তি নেই। বলেই কান্নায় ভেঙে পরে নিজের ঘরে ঢুকেছিলো রুবী। জাফর রাগ করে বসেছিলো। রাগে বিস্ময়ে আর হতাশায় মুক হয়ে যায়।

আর পরদিনই ছেড়েছিলো রুবীদের বাসা। ঠিক করেছিলো এ বাড়িতে আর ফিরে আসবে না কোনোদিন, সম্পর্ক রাখবে না এদের সাথে। রুবীকে বিয়ে করতে সে রাজি, কিন্তু তার বাবা-মার দাবি মানতে রাজি নয় কিছুতেই। সে যে বিপ্লবী; রাজনীতি তার পেশা নয়, রাজনীতি তার জীবন, রাজনীতি তার নেশা কারও অনুরোধেই এ রাজনীতি বাদ দিতে পারে না। শোষিত মানুষের মুক্তির স্বপক্ষে সংগ্রাম করে সে, এ মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এ সংগ্রাম চালিয়ে যাবেই।

দু'মাস এখানে ওখানে কাটিয়েছে। রুবীদের বাড়ির ধারে কাছ দিয়েও যায়নি। তারপর একদিন সদরঘাট দেখা হলো রুবীর বাবার সাথে। গুলিস্তানের দিক থেকে আসছিলেন তিনি, রিকশা থামিয়েই ডাক দিলেন জাফর এদিকে এসো।

কেমন আছেন মামা? বললো জাফর।

ভালো। উঠে এসো।

শরীফ সাহেবের কণ্ঠে এতো জোর দেখে না বলতে পারেনি জাফর। উঠে বসেছিলো রিকশায়।

মামী কেমন আছে? ববি কেমন?

সে কথার জবাব না দিয়ে শরীফ সাহেব বললেন-রুবী অসুস্থ।

কী হয়েছে ওর? আতঙ্কিত হয় জাফর।

ধরতে পারছে না ডাক্তারও।

বাসায় পৌঁছে সোজা রুবীর ঘরে গেছে জাফর, যা এর আগে কখনো করেনি। বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিলো। রুবী, জাফরকে দেখে দ্রুত উঠে দাঁড়ালো।

কেমন আছেন জাফর ভাই? আগে কথা বলে সঙ্কোচ কাটাতে চাইলো সে। ভালো না-তুমি?

ভালোই।

কিন্তু জাফর দেখলো অনেক রোগা হয়ে গেছে রুবী। চোখের কোণে কালি পড়েছে, মুখখানা ছোট হয়ে গেছে আকারে।

তোমার কি হয়েছে রুবী?

কই, কিছু নাতো।

রোগটা ধরতে পারলো জাফর এবার। মনে মনে অনুতপ্ত হলো। ভাবলো রুবীর মানসিক যন্ত্রণার জন্য সেই-ই দায়ী।

তুমি অসুস্থ, শুয়ে থাকো রুবী?

আপনি বলছেন? সত্যি খারাপ লাগছে আমার।

জাফরের মনে হয়েছে রুবী বলতে চেয়েছিলো- 'আমি শোবো, আপনি এখন যান।' তাতে মন খারাপ করেনি জাফর। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মামীর কাছে বসেছিলো। এরপর আজকের এই আসা। স্পেশাল স্কোয়াড সম্পর্কে তথ্য নেওয়ার ছুতোয় কি যেনো এক অদৃশ্য শক্তি ও বাড়িতে টেনে এনেছে তাকে। অচেনা এক রোজী সম্পর্কে রুবীর সেই কথা আর বাবুলের আজকের কথাগুলো তার মনে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। বাবুল কি এই রুবীকেই রাজকুমারী আর মন্ত্রীর মেয়ে বলে টিপ্পনী কেটেছে? রুবী কি তাহলে জাফরের সাথে প্রতারণা করে মিথ্যা পরিচয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্য লোকের সঙ্গে? অন্যদিকে সেই রোজীটি কে। জাফর নিশ্চিতভাবে এ নামের কারও সাথে পরিচিত নয়। তাহলে রুবী কেনো রোজীর সাথে জাফরকে মিছেমিছি জড়িয়ে কথা বলেছিলো? নিশ্চয়ই সে জাফরের সম্বন্ধে কিছু গুজব শুনেছে। তবে কি বাবুলই সেই গুজব রটনাকারী?

নানা ভাবনার উত্তাল তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছিলো জাফরের মনে। সেই তরঙ্গই বুঝি কচুরিপানার মতো ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এলো জাফরকে রুবীদের বাড়িতে। একটি কার্যকলাপের পিছনে একাধিক শর্ত থাকার মতো এছাড়াও আরও কারণ ছিলো এ

বাড়িতে আসার। অসুস্থ রুবীকে আগের বার দেখে গেছে সে। রুবীকে দেখার জন্য প্রাণের আকুতিও ছিলো জাফরের। রুবীর প্রতি তার সন্দেহ আর ঘৃণা বৃদ্ধি পাচ্ছে যতো, ততোই বাড়তে লাগলো তার প্রতি জাফরের ভালোবাসা। এ জগতে প্রেম যেনো ঘৃণার সাথেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলে।

রাত দশটার দিকে রুবীদের দরজায় টোকা দেয় জাফর। একটু আগে থেকেই ঝড়ো হাওয়া বইছিলো, তার গতি এখন বেড়েছে কিছুটা। বাতাসের শব্দেই বুঝি জাফরের টোকার শব্দ হারিয়ে গেলো। নিজের প্রতি আস্থা হারালো জাফর অল্পক্ষণের জন্যে হলেও। অসুস্থ রুবীকে দেখে যাওয়ার পর খোঁজ নিতেও আসেনি। এ অপরাধ বোধই যে তার আঙুলের শক্তি হরণ করেছে, টোকা দিলেও শব্দ হচ্ছে না বুঝতে পারছে জাফর।

একবার ভাবলো রাত হয়েছে, চলে যাই। পরক্ষণেই জেদ চাড়া দিয়ে। উঠলো তার মনে। "এতো দুর্বল তো নয় আমার মন।" নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে দ্রুত করাঘাত শুরু করলো সে দরজায়।

কে ওখানে?

খোলো।

বাইরের বাতাসের শব্দে গলার আওয়াজ সম্পূর্ণ বুঝা না গেলেও পরিচিত কেউ মনে হলো। কিন্তু দরজার বাইরে যে জাফরই দাঁড়িয়ে আছে-এ রকম ধারণা ছিলো না রুবীর। দরজা খুলেই জাফরকে দেখে হতভম্ব হয়ে যায় সে। হতভম্ব জাফরও। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো দু'জন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। ঝড়ো হাওয়ার মাতামাতিতে রুবীর চুলগুলো বিদ্রোহী হয়ে উড়তে লাগলো এলোমেলো শাড়ির আঁচলটাও দাপাদাপি করছে। মুখ খুললো রুবীই।

ঝড় আসছে ঘরে আসুন।

ভেতরে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করলো জাফর-তোমার শরীর কেমন? সেরে যাচ্ছে। সংক্ষেপে জবাব দেয় রুবী।

মামী কেমন আছেন?

সর্দিজ্বর হয়েছে। শুয়ে পড়েছেন।

মামা কোথায়?

চিটাগাং গেছেন অফিসের কাজে।

আর ববি?

ববি ঘুমাচ্ছে। আপনি ঘরে যান।

পরদিন রুবীর ঘরে গিয়ে একটি নতুন জিনিস দেখতে পেলো জাফর। দেয়ালে টাঙ্গানো একটি যুগল ছবি। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দুই রুবী। একজনের পরনে প্রিন্টের শাড়ি-রুবীর পরনে যে শাড়িটি দেখেছি সকালে; দু'বেণী চুল-রুবী যেমন বেণী গেঁথেছিলো সকালে, প্রসাধনবিহীন স্নিগ্ধ ঠোঁট- মুখ রুবী তেমন সারাক্ষণ থাকে; অন্য রুবী পরেছে

হাতাকাটা সংক্ষিপ্ত ব্লাউজের সাথে দামি কাতান, মাথার উপরে উঁচু করে খোঁপা বাঁধা চুল-ঠোঁটে মুখাবয়বে কড়া প্রসাধনী-শাড়ির রঙ ছাড়া হুবহু এরকম সাজে রুবীকে দেখেছে জাফর ইন্টারকনে।

একই সাথে দুটি চরিত্রের প্রকাশ-চমৎকার।

বিড়বিড় করে বললো জাফর। মনে মনে ধব্যবাদ জানালো ক্যামেরা কৌশলের।

পিছনে শব্দ হতেই তাকিয়ে দেখল রুবী আসছে।

চমৎকার ছবিটি। ব্যঙ্গ সুরে বলে ওঠে জাফর।

ববিও তাই বলে। বললো রুবী।

একজন কেরানির মেয়ে অন্যজন মন্ত্রী-নন্দিনী।

কেনো? কেরানি-নন্দিনী আর মন্ত্রীর মেয়ে হয় না? রুবীর কণ্ঠ গম্ভীর।

হয়। কিন্তু মামা কি এই দু'জনকে চেনেন?

হু-তিনি তো বলেন দুটোই আমার মেয়ে।

রুবীকে হাসতে দেখে রাগে ফেটে পড়ে জাফর।

সত্যি সত্যিই কি তুমি মন্ত্রীর মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে বেড়াও, হোটেলে যাও, বন্ধুদের সাথে ডিনার খেতে যাও, বাবুলের মতো মাতালের সাথে বসে গল্প করো? তোমার কি এতই অধঃপতন ঘটেছে?

বলতে বলতে রুবীকে ধরে ঝাঁকি দিতে থাকে জাফর।

ভয় পেয়ে যায় রুবী। জাফরকে অগ্নি মূর্তি হতে দেখে কণ্ঠ শুকিয়ে আসে তার। নিজের অজান্তে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে-হ্যাঁ।

থমকে যায় জাফর। দ্রুত ছেড়ে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে-ধন্যবাদ। কিসের?

সত্য ভাষণের জন্য।

সত্য, সত্য, কিসের সত্য? কি করে তুমি বিশ্বাস করলে আমি এমন ভন্ড, প্রতারক চরিত্রহীনা? কোথেকে কাকে দেখে আসবে আর তার শোধ নেবে আমার উপর । দুটো চোখ নেই তোমার? কোনটা কে বুঝতে পারো না। বিছানায় ছুটে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে রুবী।

ভড়কে যায় জাফর। কিছু একটা ভুল হয়ে গেছে ভাবতে থাকে সে। ধীরে ধীরে বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়। সান্ত্বনা দিতে হাত বাড়াতে গিয়েও সাহস পায় না।

ষোল অধ্যায়

দু'দিন পরের কথা।
বিকেলে মোহাম্মদপুর গিয়েছিলো জাফর স্থানীয় জাসদ কর্মীদের পাঠচক্রে অংশ নিতে। শহীদ সলিমুল্লাহ রোডের এক বাসায় প্রতি শনিবার এই পাঠচক্রের ক্লাস হতো। সন্ধ্যের কিছু আগে মাত্র ছাড়া পেয়েছে সেখান থেকে ফেরার পথে মোহাম্মদপুর বাজারে একজনের সাথে দেখা করে আসাদ গেটের দিকে আসছিলো। রাস্তার দু'পাশেই পুরানো কাপড় আর ব্যবহৃত জিনিসপত্রের বাজার বসে বিকেল থেকে। ব্যবহৃত জিনিসপত্র বিক্রি করছে অবাঙালিরা।
স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের কর্মীরা শুধু তাদের ঘরবাড়ি দখল করে নেয়নি, দখল করে নিয়েছে তাদের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট। বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পর এসব অবাঙালিদের করুণ অবস্থা এখন। যা কিছু সরাতে পেরেছিলো সাথে করে, সেগুলোই বেঁচে বেঁচে খাওয়ার পয়সা জোগাড় করছে এখন।
রাস্তার ডান পাশ দিয়ে হাঁটছিলো জাফর। এ সময়ে রাস্তার এ অংশে ভিড় থাকে কিছুটা। অনেকগুলো রিকশা একটার পিছে আরেকটা লাগালাগি হয়ে ছুটে আসছিলো বিপরীত দিক থেকে। একটু সামনে থেকে একটা লাল ডাটসান গাড়ি এগিয়ে আসতে পথ পাচ্ছিলো না রিকশার ভিড়ের জন্য। খানিক দূর থেকে জাফর দেখলো-সে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে আছে একটি মেয়ে। মুখ বের করে ধমকাচ্ছে একজন রিকশাওয়ালাকে, রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছে না বলে। হঠাৎ মনে হলো তার রুবী চালাচ্ছে গাড়ি।
হ্যাঁ, রুবীই তো সে? কৌতূহলী হয়ে ফুটপাত থেকে নেমে এলো রাস্তায়। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নিকট থেকে তাকে দেখবে বলে।
মেয়েটিও বুঝি দেখতে পেলো তাকে। সেও দ্রুত সাইড নিতে যাচ্ছে। জাফর উঁকি দিয়ে দেখার আগেই ডাটসান গাড়ির সামনের অংশ যেনো লাফিয়ে এসে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিলো তাকে।
গাড়ি থামিয়ে দ্রুত নেমে এলো রোজী। ছিটকে পড়ে আছে জাফর, শরীরের অর্ধেক ফুটপাতে অর্ধেক নিচের রাস্তায়। মাথায় চোট লেগেছে, রক্ত বের হচ্ছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে সে।

দ্রুত ভিড় জমে যায়। তারও চেয়ে বেশি দ্রুত জাফরকে কোলে তোলে গাড়িতে উঠিয়ে নেয় রোজী। পথচারী দু'জন লোককে ডেকে বসায় গাড়িতে।
হসপিটাল পর্যন্ত সামলে রাখুন ওকে। বলে দ্রুত স্টার্ট নেয় গাড়িতে। ঘুরিয়ে সোজা রওয়ানা দেয় পি. জি. হাসপাতালের দিকে
সন্ধ্যে থেকে সারারাত হাসপাতালে ছিলো রোজী। বাসায় টেলিফোন করে। মাকে বলে দিয়েছে তার এক বন্ধু এক্সিডেন্ট করেছে, রাতে তাকে থাকতে হবে হাসপাতালে। জানিয়েছে রুবীও থাকবে তার সাথে।

সাথে যে দু'জন লোক এসেছিলো তাদের একজনকে দিয়েই সে খবর পাঠালো রুবীদের বাসায়।

অজ্ঞান হয়ে আছে জাফর। ডাক্তার বলেছেন, "আঘাত গুরুতর নয়। আহতের চেয়ে ক্লান্তই বেশি।

ঘণ্টা খানেক পর হুঁশ ফিরে আসে। ব্যান্ডেজ করতে গিয়ে দুটো চোখ ঢেকে দিতে হয়েছে। জ্ঞান ফিরে পেয়েই নড়ে উঠলো জাফর। ডাক্তার তক্ষুনি মরফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। বললেন-তাকে যেনো ঘুম থেকে জাগানো না হয়।

রাত আটটার দিকে রুবী, ববি, শরীফ সাহেব আর সালমা বেগম যখন হাসপাতালে এলেন, রোজী তখন জাফরের মাথাটি কোলে নিয়ে বসে আছে।

কী হয়েছে জাফরের? চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন বেগম। তখুনি রোজী ইঙ্গিতে থামিয়ে দিলো তাদের। আলগোছে মাথাটি বালিশে রেখে সম্পূর্ণ ঘটনাটি অনুচ্চ কণ্ঠে বলে গেলো রোজী।

শরীফ সাহেব ডাক্তারের কাছে গেছেন অবস্থাটা জানতে। রুবী এগিয়ে এসে মাথার কাছে বসে গেলো রোজীর জায়গাটি দখল করে। কিন্তু রোজীর মতো কোলে তুলে নিতে পারলো না জাফরের মাথাটি।

শরীফ সাহেব ডাক্তারকে সাথে করে ফিরে এলেন এক মিনিটের মধ্যে। মন্ত্রীর মেয়ে বলেই তোমার এতো অহংকার রোজী? আমার জাফরকে মেরে ফেললে তুমি? ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন রুবীর মা?

আহ কি বলছো যা তা! থামোতো। সেকি ইচ্ছে করে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। ধমকের সুরে বললেন শরীফ সাহেব।

ইচ্ছে নয়তো কি? ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে নাকি ওর। মন্ত্রীর মেয়ে বলেই না বেআইনি গাড়ি চালায়।

লজ্জায় নুইয়ে আসে রোজীর মাথা। ডাক্তার দ্রুত সচেতন হয়ে গেছেন রোজীর পরিচয় পেয়ে। এটা ওটা করতে চেষ্টা করছেন তিনি ব্যস্ততার পরিচয় দিয়ে।

ভোর ছটার দিকে জাফরকে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড থেকে সরিয়ে কেবিনে নিয়ে যাওয়া হলো।

পর দিন দশটার দিকে ঘুম ভাঙলো জাফরের। মনে পড়লো দুর্ঘটনার কথা। চোখ মেলতে গিয়ে দেখলো কি একটা বাধা আছে যেনো। হাত দিয়ে ব্যান্ডেজ সরাতে গেলেই রুবী চেপে ধরলো তার হাত।

কে? প্রশ্ন করলো জাফর।

আমি রুবী। মা, বাবা, ববি সবাই আছি এখানে। চিন্তা করবেন না।

জাফর বুঝতে পারে সে এখন হাসপাতালে।

কোন হাসপাতাল এটা? শুধায় সে।

পি. জি. হাসপাতাল

এখন কেমন লাগছে বাবা? জিজ্ঞেস করলেন সালমা বেগম।

মাথাটায় চিনচিন ব্যথা করছে।

ঠিক হয়ে যাবে, তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো শরীফ সাহেব এগিয়ে এসে মাথায় হাত বুলালেন আলতোভাবে।

রোজীও এখানে আছে। একসিডেন্ট ঘটিয়ে সে এখন কষ্ট পাচ্ছে মনে মনে। সেই তো এখানে নিয়ে এসেছে তোমাকে।

জাফর তার ভুল ধরতে পেরেছিলো দুর্ঘটনা ঘটার কয়েক সেকেন্ড আগে। বললো- রোজী কে মামা?

শিল্পমন্ত্রীর মেয়ে। রুবীর সাথেই পড়ে।

জাফরের ইচ্ছে হলো মেয়েটিকে এক্ষুনি একবার দেখে। রুবীর সাথে যার চেহারার এতো মিল, তাকে আর রুবীকে একসাথে দেখতে মজাই লাগবে। বিকেলে ব্যান্ডেজ খুলবে। সে আপনার সাথেই থাকবে এখানে। আপনি চুপ করে শুয়ে থাকুন। ডাক্তার বারণ করেছে বেশি কথা বলতে। জাফরের মনের কথা বুঝে নিয়েই বললো রুবী।

বিকেলে ব্যান্ডেজ খুলতেই চোখ মেলে রুবী আর রোজীকে একসাথে সামনে দেখলো জাফর। কয়েকবার মিটমিট করে, দুবার চোখ কচলে দু'জনের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলো। তারপর রুবীর দিকে তাকিয়ে বললো-

বড্ড ভুল হয়ে গেছে রুবী, তোমাদের একই রকম চেহারা আমাকে বেশ ক'বার বোকা বানিয়েছে।

গুরুতর অপরাধের বোঝা নিয়ে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে ছিলো রোজী চুপচাপ। তা দেখে জাফর বললো-আপনার কোনো দোষ নেই। আমিই আপনাকে রুবী মনে করে এগিয়ে গিয়েছিলাম গাড়ির দিকে অন্যমনস্কভাবে। এ বরং ভালোই হলো, ভুলটা ভাঙলো। মোটা লাভ হয়েছে আমার এই দুর্ঘটনার জন্য।

এরপর আরো দু'দিন হাসপাতালে ছিলো। তৃতীয় দিন সকালে এসে রোজী জানতে পারলো-আগের দিন রাতেই হাসপাতালের বিল মিটিয়ে চলে গেছে জাফর। গতকাল বিকেলেও রোজী-রুবী এসেছে। জাফর কোনো কিছুই জানায়নি চলে যাওয়ার ব্যাপারে। সুপারিন্টেন্ডেন্টকে জিজ্ঞেস করলো রোজী কেউ এসেছিলো নিতে?

তার এক বন্ধু এসে বিল মিটিয়ে রিলিজ করে নিয়ে গেছেন।

হাসপাতাল ছেড়ে গেছে জাফর, এ খবর রুবীদের বাসায় পৌঁছে দিতে গিয়েছিলো রোজী। মনে মনে আশা করেছিলো হয়তো জাফরকে পেয়ে যাবে সেখানে। কিন্তু সেখানে ছিলো না জাফর।

কোথায় গেলো তবে?

তার কি ঠিক আছে? বরাবর এমনিই করে। এ বাসায় যতো দিন ছিলো কখন বেরুচ্ছে, ক'দিনের জন্যে বেরুচ্ছে কিছুই জানাতো না কাউকে। তুই চিন্তা করিসনে। হয়তো পার্টির কাজে টেনে নিয়ে গেছে সাথিরা।

যদি স্পেশাল স্কোয়ার্ড নিয়ে থাকে।

স্পেশাল স্কোয়ার্ড, সে আবার কি? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে রুবী।
স্পেশাল কিলিং স্কোয়ার্ড। সরকারের গুপ্তঘাতক বাহিনী। ক'দিন আগে মাত্র গঠিত হয়েছে। চারটি সাদা জিপে করে ঢাকা শহরে ঘুরে বেড়ায় ওরা শিকারের খোঁজে।
কাদের খুন করে এরা? আতঙ্কে কেঁপে ওঠে রুবীর বুক।
বিরোধী রাজনৈতিক শত্রুকে। জাফরকে সাবধানে রাখবি। আমার সন্দেহ হচ্ছে- জাসদের অনেক কর্মীই নিখোঁজ হয়ে যাবে ক'দিনেই।

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে রুবী। জাফরকে সামলানোর বিরাট এক দায়িত্বের বোঝা অনুভব করে সে-যা তার একার পক্ষে পালন করা সম্ভব

নয়।
রুবী বললো-সে এলে তোকে ডেকে পাঠাবো। তুই সব কিছু খুলে বলিস

ওর কাছে।

সতের অধ্যায়

রুবীদের বাসা থেকে যখন বাড়ি ফিরলো রোজী তখন বেলা প্রায় বারোটা। এসেই দেখালো তার মা-বাবার মধ্যে তর্ক চলছে কি নিয়ে যেনো।

খানিক আগে বাসায় ফিরে জামান সাহেব যেই দেখলেন ঘরে রোজী নেই, অমনি মেজাজ তার চড়ে গেছে। একজন সহযোগী মন্ত্রী আজ তাকে রোজীর যত্রতত্র ঘোরাঘুরির কথা জানিয়ে বলেছেন- যাদের সাথে সে চলাফেরা করে, হোটেলে যায় ডিনার খেতে; তারা আমাদের দলেরই কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছোকরা। তাদের আজেবাজে কিছু কমেন্ট আমার কানে এসেছে বলেই ব্যাপারটি জানালাম আপনাকে। আমার আর আপনার মেয়েতে আমি কোনো তফাৎ দেখিনে।

রোজীর বাইরে ঘোরাঘুরির ব্যাপার নিয়ে কোনো কথা বলতে সাহস পান না জামান সাহেব। মেয়ের বাড়াবাড়ির কথা বলতে গেলে রুখে আসেন তাঁর স্ত্রী। বলেন-আগে তোমার নিজের চরিত্র সংশোধন করো।

জামান সাহেব তখন কথা বলতে পারেন না। মদ আর মেয়ে মানুষের সঙ্গ নিয়েই বেঁচে আছেন তিনি! একটা সময় পর্যন্ত একে বদঅভ্যাস বলা যেতো কিন্তু আজ আর তা নয়! বদঅভ্যাসে বদঅভ্যাসে এখন তা বেঁচে থাকার অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর কাছে। বাইরে তিনি যা-ই করেন না কেনো, ঘরে ফিরে নিজের যুবতী মেয়েকে দেখলেই অজানা ভয়ে আঁতকে উঠেন তাঁর মেয়েটিও যদি সেই মেয়েগুলোর মতো হয়ে যায় একদিন! বাসায় ফিরতে ফিরতে মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন তিনি। রোজীকে শেষবারের মতো সাবধান করে দেবেন। সহকর্মীর কথায় খুব একটা দুশ্চিন্তা ছিলো না তার মেয়ের প্রতি অতটুকু আস্থা তার আছে। কিন্তু যে কথাটি জানিয়েছেন ডাক্তার শামীম, আর সেই বখাটে ছেলে সম্পর্কে যে রিপোর্ট আজ গোয়েন্দা বিভাগের কাছ থেকে পেয়েছেন তাতে শুধু তার মান-মর্যাদার প্রতি হুমকিই নয়, অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। কি দুঃসাহস ঐ ছেলেটির। কোথায় হাত রেখেছে সে। মেয়েকে বাসায় দেখতে না পেয়ে স্ত্রীর সাথেই লেগে গেলেন তিনি।

রোজীকে ঘরে ঢুকতে দেখে সহসাই থেমে যান জামান সাহেব। দ্রুত মুড পাল্টে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন-

রোজী, এদিকে এসো।

ভীরু পায়ে এগিয়ে যায় রোজী। চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ, চুল এলোমেলো, মলিন মুখ- ঠিক যেমন গত রাতের মেয়েটিকে দেখেছেন হোটেলে তার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে চলে যাবার সময়। মনে পড়তেই রাগ বেড়ে গেলো জামান সাহেবের।

কোথায় ছিলে তুমি পরশু রাতে?

পি, জি, হসপিটালে। জবাব দেয় রোজী,

তোমার কোন বন্ধু দুর্ঘটনায় পড়েছিলো।

জাফর।

জাফর! বলে গর্জে উঠলেন তিনি। কিসের বন্ধুত্ব ঐ ভবঘুরে লম্পটের সাথে? জানো তুমি কে সে?

জানি। একজন বিপ্লবী।

সে একটা আস্ত লম্পট। নিজেকে একজন মহাবিপ্লবী বলে পরিচয় দেয়। কতগুলো ছোটলোকের ছেলে স্বাধীনতার পরে যারা শুধু বিপ্লব বিপ্লব করে লাফাচ্ছে সে তাদেরই একজন। সাবধান! ওর পিছনে আবার যদি যাও তাহলে তোমাকেও গুলি করে উড়িয়ে দেবো।

রোজী চুপচাপ দাঁড়িয়ে। বাপের রাগ আজ তার রাগও বাড়িয়ে দিয়েছে। ক্ষোভে-দুঃখে ফেটে পড়ে সে বললো-

গুলি করবেন করেন। আপনাদের হাতে তো ঐ একটা মাত্র জিনিস আছে। নিজের দোষে গাড়ি চাপা দিয়েছিলাম জাফরকে। হসপিটালে তার পাশে থাকা আপনার চোখে অন্যায় হলেও আমার চোখে নয়। আর জাফর কখনো লম্পট নয়। সে একজন চরিত্রবান বিপ্লবী, একজন দেশপ্রেমিক সে। শাট আপ। দিন দিন তোমার স্পর্ধা দেখছি বেড়ে যাচ্ছে। লজ্জা শরমের মাথা খেয়েছো আজকাল। বাপের সামনে দাঁড়িয়ে একটা ফালতু ছেলের প্রশংসা করতে তোমার মুখেও বাঁধছে না একটু। ক্রোধ প্রশমিত করে বললেন জামান সাহেব।

আপনি তাকে লম্পট বললেন বলেই সঠিক কথাটি আপনাকে জানাতে বাধ্য হলাম। রোজী! বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে। তোমার অন্তত মনে রাখা উচিত যে, আমি তোমার বাবা।

বাড়াবাড়ি আপনিও করছেন আব্বা। আমি বড়ো হয়েছি। আপনারও মনে রাখা উচিত আমার সাথে কীভাবে কথা বলতে হয়।

ওহ গড। এতো স্পর্ধা তোমার! এতোখানি এগিয়ে গেছো, আজ বাপকে কর্তব্যজ্ঞান শেখাচ্ছো। ফরিদা, ফরিদা দেখে যাও, তোমার আহ্লাদি মেয়ের কাণ্ড। নিজের চোখে দেখে যাও-আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে কোথায় উঠিয়েছো তাকে।

মাকে ডাকতে হবে না। আমিই আপনার সব কথার উত্তর দেবো। আমারও অনেক প্রশ্ন রয়েছে আপনার কাছে। আমার চোখের সামনে বাবা হয়ে এতোদিন যে আচরণ আপনি করেছেন তা আমি আর মা দু'জনেই নীরবে সহ্য করেছি। কোনোদিন কোনো কথা বলিনি। আজ আর নয়। আজ আমি ছেড়ে কথা বলবো না আপনাকে।

ক্ষোভে-দুঃখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে রোজী। ফরিদা বেগম সেখানে মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। কোনো কথাই বললেন না।

জামান সাহেবের রাগের মাত্রা সহসাই কমে গেছে। আগুনে পোড়া একখন্ড গরম লোহা হঠাৎ পানিতে ডুবালে যে রকম রঙ ধারণ করে, তার মুখের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে তেমনি রঙ নিয়েছে। স্ত্রীকে কাছে এসে দাঁড়াতে দেখে কিছুটা সাহস পেলেন তিনি। ভাবলেন হয়তো মেয়ের প্রচণ্ড আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে যাবেন এবারকার

মতো। শুকনো পাংশুটে মুখে স্ত্রীকে বললেন- দেখো ফরিদা। তোমার মেয়ের কাণ্ড দেখো। এসব তোমার আহ্লাদেই হয়েছে, নইলে আমার সামনে দাঁড়িয়ে এতো সব কথা বলতে সাহস পেতো ও কক্ষণো?

স্বামীর কথায় ফরিদা বেগম চটে ওঠে জবাব দিলেন বারবার আমাকে দোষারোপ করবে না তুমি। তুমি বুঝি ওকে কম আহ্লাদ দিয়েছো। এখন বুঝি শুধু আমারই দোষ!

হ্যাঁ হ্যাঁ তোমারই সব দোষ-তোমারই। আজ পরিষ্কার বলে রাখছি, মেয়ে যেনো আর ঘর থেকে এক কদম বের না হয়, তাহলে তোমারও কপালে ভোগান্তি আছে।

কি যে যা তা বকছো। তোমার মাথা ঠিক আছে তো আজ?

রুক্ষভাবে বললেন ফরিদা বেগম।

তোমরা মা-মেয়ে মিলে আমাকে পাগল করে তুলেছো দেখছি-আমাকেই ঘর থেকে তাড়াবে মনে হচ্ছে।

ঘরে তুমি ছিলেই বা করে। সব সময়েই তো বাইরে বাইরে কাটাও-এর পিছনে ওর পিছনে। বিদ্রুপের সুর আসে তক্ষুনি।

আর তুমি? জামান সাহেবের কণ্ঠেও তীক্ষ্ণ হয় বিদ্রুপ। আমি তো বাইরে যাই তোমার মতো ঘরে বসেই অনেককে পাই না বলে। যখনই ঘরে ফিরি, তখনই তো দেখি-

থামবে তুমি! ধমকে উঠেন ফরিদা বেগম। মুখে একটুও লজ্জা নেই তোমার! মেয়ের সামনেই এমন বাজে কথা বলতে পারলে। ছিঃ ছিঃ তোমার এতো অধঃপতন ঘটেছে। তারপর রোজীকে বললেন-যা রোজী, সরে যা। কি শুনছিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

তিক্ত এক টুকরো হাসিমুখে এনে রোজী প্রতিবাদ করে বললো- আমি আজ আর যাচ্ছিনে। অনেকদিন তো পালিয়ে গেছি এ রকম পরিবেশ থেকে বাঁচতে। আজ আর যাচ্ছি নে। সব শুনবো আজ। আমি আর ছোট্ট খুকী নই। আমি সব বুঝি এখন। কোনো দোষ করিনি, অন্যায় করিনি, শুধু কর্তব্যের খাতিরে পরশু রাতে জাফরকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। আমার গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়েছিলো বলে আমিই ছিলাম দোষী। মানবতার খাতিরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছি; রাত জেগে সেবা করেছি। আমি তো একজন সাধারণ মেয়ে। মন্ত্রীর মেয়ে হতে পারি-মন্ত্রী নই। মন্ত্রীরা রাস্তা পরিষ্কার করে পথ চলতে পারেন, আমি পারি না। গাড়ি চাপা দিয়েও চলে যেতে পারেন তারা, আমি তা পারিনি। সামান্য এই বিষয়টিকে জটিল করে নিজেদের চরিত্র উদঘাটন করতে উঠেপড়ে লেগেছেন আপনারা একটি মেয়ের সুখ-দুঃখ বুঝবার মতো ক্ষমতাও আপনাদের নেই। টপটপ করে রোজীর দু'চোখ থেকে পানি ঝরতে থাকে। কিন্তু মুহূর্তেই নিজেকে সংযত করে নেয়। তারপর বলে-

মন্ত্রী হওয়ার আগে ভালোই ছিলেন, মন্ত্রীত্বই আপনার মাথা খেয়েছে। শুধু আপনি নন, বাংলাদেশের প্রত্যেক মন্ত্রীরই এই এক দশা। গায়ের জোরে হুমকি দিচ্ছেন শুধু জনগণকে নয়, নিজের সন্তানকেও। কিন্তু দেয়ালে দেয়ালে চোখ রাখলেই দেখবেন- একটি বলবান বেগবান শক্তি-শক্তি নাশ করতে আসছে আপনাদের।

রোজীর কথায় বাধা দেওয়ার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন জামান সাহেব। এমন তীক্ষ্ণ সত্য কথা শিখলো কোথায় সে ভাবতে থাকেন তিনি নিশ্চয়ই জাফরদের সাথে তার যোগাযোগ আছে, সেখান থেকে এতো স্পর্ধা লাভ করছে রোজী দিনকে দিন। কিন্তু এ কিছুতেই হতে পারে না। একবার মনে হয়েছে যে রকম ক'টি কথা এইমাত্র বললো রোজী-রাজনীতি করলে নাম করতে পারতো, বক্তৃতায় আকৃষ্ট করতে পারতো সবাইকে। পরক্ষণেই ভাবলেন-তা হবার নয়। ওর শিক্ষার শেকড় যদি থাকে জাসদের মূলমন্ত্রে, তবে আর বাগে আনা যাবে না কিছুতেই। তারচেয়ে ঠান্ডা করাই উত্তম। বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, মনে মনে স্থির করলেন তিনি।

গভীর দৃষ্টি নিয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন জামান সাহেব তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে ওর ভেতরটুকু জানতে চান, কিন্তু কোনো আলোরই প্রতিফলন দেখলেন না সে মুখে, মনে হলো যেনো অন্ধকারে আয়নার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো রোজী। বেরিয়ে যেতেই মুখিয়ে উঠেন ফরিদা বেগম-দোষ ওর নয়, দোষ তোমার। এতো বড় মেয়েকে অমন করে। কথা জিজ্ঞেস না করলেই কি হতো না। গা চুলকে রক্ত বের করেছো, জ্বালা তো করবেই।

নরম অথচ ঠেস লাগানো কণ্ঠে স্বামীকে সান্ত্বনা দিলেন।

তুমি সব সময়ই মেয়ের পক্ষ নিয়ে কথা বলো ফরিদা। ঐটা বোধহয় সব মায়েরই দোষ। সে যাই হোক, আমি ভেবে দেখলাম মেয়েকে আর বেশিদিন ঘরে রাখা চলে না, শীঘ্রই বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। নইলে-

নইলে কি তোমার সব গোমর ফাঁক করে দেবে, এইতো। শোনো, তুমিও আর বাড়াবাড়ি করো না। মন্ত্রীত্ব থাক আর গোল্লায় যাক, এবার দেখো জীবনটা বাঁচাতে পারো নাকি। মিটিংয়ে বেশি কথা বলো না। বেশি চোটপাট করো না। তোমার যা মন্ত্রী এক একজন। জীবনে এমন কথা শুনিনি যে, কোনো প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্য সভায় বলে যে, অমুক দলের লোককে দেখা মাত্র গুলি করা হবে। তোমাদের প্রধানমন্ত্রী সবই বলতে পারেন। দায়-দায়িত্বের বালাই যখন নেই, বলতে তো পারেনই।

একটু থেমে আবার বললেন-রোজী যে ইঙ্গিত দিয়ে গেলো আজ তা সত্যি বলেই মনে হয়। এদেশের মানুষ তলে তলে দারুণ বিক্ষুব্ধ, শীঘ্রই ফেটে পড়বে, মতো আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে স্রোতের দুর্বার টানে। জামান সাহেব বুঝলেন তাঁর স্ত্রীই মেয়েকে দিয়ে অতো কথা বলিয়েছেন তাহলে। বললেন, আমরা মোটেও ভীত নই সেজন্য। ওদের দমন করতে বদ্ধপরিকর আমরা।

যতোই বদ্ধপরিকর থাকো না কেনো, ইতিহাস কখনো ছেড়ে কথা বলে না। কৃষক-শ্রমিক সবাই জোট বেঁধে যদি রাস্তায় নামে ওদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা কিন্তু তোমাদের নেই। শোনো না ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, কোরিয়া, ইন্দোচীন, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর কথা। আমেরিকা নিজের সৈন্য, অস্ত্র আর অর্থ দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করছে, কিন্তু পারছে কি? তোমরাও পারবে না।

আরে যাও যাও রাখো ওসব কথা। সে দেখা যাবে। এখন আমার কথা শোনো। রোজীর বিয়ে আমাদের রক্ষীবাহিনীর একজন ডেপুটি ডাইরেক্টরের সঙ্গে দেবো ভাবছি। ছেলেটি দেখতে সুদর্শন, বলিষ্ঠ চেহারা। তাছাড়া রক্ষীবাহিনীটাও আমাদের হাতে থাকবে, বিপদে-আপদে কাজে লাগবে। না না। অমন কথা মুখেও এনো না। রক্ষীবাহিনীকে এদেশের মানুষ দু'চোখে দেখতে পারে না। ওদের উপরে ক্ষ্যাপা সবচে' বেশি। মেয়েকে রক্ষীবাহিনীর কারো সাথে বিয়ে দেওয়া আর রক্ষীবাহিনীর হাতে সঁপে দেওয়া যে একই কথা। তাছাড়া যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, অল্প বয়সে বিধবা হতে দিতে পারি না।

কি যে বলছো তুমি? রক্ষীবাহিনীই তো সবচে' ক্ষমতাসীন। রক্ষীবাহিনীকেই মানুষ বেশি পছন্দ করে। আদর করে ডাকে লক্ষ্মী বাহিনী। গর্বের সাথে বলেন জামান সাহেব।

লক্ষ্মী বাহিনী না ছাই ডাকে। তুমি দেখছি নিজের বোতল ছাড়া আজকাল আর কিছুরই খবর রাখো না। ভাসানী ন্যাপের কামরুল ইসলাম সালাউদ্দীন না রক্ষীবাহিনীকে ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী বলেছেন জাতীয় সংসদে। পত্র- পত্রিকায়ও তো লেখে। মুখে তো যে যা ইচ্ছা তাই বলে। কেউ বলে টিয়া বাহিনী, কেউ বলে গুন্ডাবাহিনী আবার কেউ কেউ বলে 'দিদি বাহিনী কোত্থেকে কি সব শুনে তুমিও যাতা ভাবছ রক্ষীবাহিনীকে। অথচ এরা কত কাজ করছে দেশের মানুষের জন্য।

করছে বটে। ব্যঙ্গস্বরে বললেন ফরিদা বেগম-দেশের কতো কাণ্ড করছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক গাড়ি করে ফিরছিলেন, রক্ষীবাহিনীর গাড়ি যাওয়ার পথ ছেড়ে দেননি বলে পিটুনি খেয়েছেন তিনি। আর কি অবাক কাণ্ড ঐ একই দিনে জুলাই মাসের চার তারিখেই চট্টগ্রামে ঘটলো আরেক কাণ্ড, রক্ষীবাহিনীর গাড়িকে ওভারটেক করেছে বলে গুলি চালিয়েছে তারা যাত্রীবাহী বাসের উপর। হতাহত হয়েছে পঁচিশ জন। ময়মনসিংহ থেকে চট্টগ্রাম নয় শুধু, তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত এতো ভালো ভালো কাজই করেছে তারা দেশের মানুষের জন্য।

বাজে সব পত্রিকায় মিথ্যে কিছু সংবাদ পড়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু গণকণ্ঠ পত্রিকা যে তোমরাও নিয়মিত পড়ো সে তো তোমার কথা শুনেই বুঝা যাচ্ছে। হেসে ফেললেন ফরিদা বেগম। বললেন-সে যাই হোক। ডেপুটিই হোক বা ডাইরেক্টরই হোক, রক্ষীবাহিনীর কাছে মেয়ে বিয়ে দেবো না দৃঢ়তা ফুটে উঠলো তাঁর কণ্ঠে। জামান সাহেব হাল ছেড়ে দিলেন এবার। তবু ভাবলেন স্ত্রীর চেয়ে তাঁর নিজের ক্ষমতা বেশি।

বললেন-সেটা আমি দেখবো তুমি গিয়ে দেখো-মেয়েটা কি কান্নাই না কাঁদছে জানি এখন। ছলছল করে ওঠে ফরিদা বেগমের দু'চোখ। দ্রুত ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হন তিনি।

আঠারো অধ্যায়

পি. জি. হাসপাতাল থেকে সেদিন বন্ধু সানির সঙ্গে জাফর সোজা গিয়ে ওঠে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির আহসানউল্লাহ হলে। ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র সানি। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো, রাজনীতিতে জড়িয়েছে স্বাধীনতার পর থেকে। মেধাবী ছাত্র মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান পেয়েছিলো। অবশ্য এটা খুব একটা বিবেচ্য বিষয় নয়। সমাজে ইঞ্জিনিয়ারদের একটা বিশেষ মূল্য আছে বলেই এ মূল্য লাভের জন্য কঠিন প্রতিযোগিতার প্রয়োজন পড়ে। যারাই এখানে ভর্তি হয় সবাই সে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ। মেধাবী আর নামকরা ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান এটি। এদিক দিয়ে গর্ব করার অধিকার রাখে এই ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি। কিন্তু তারচেয়ে বেশি গর্বের দাবি আছে তার। স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে প্রতিরোধ সামাজিক আন্দোলনের ঘাঁটি এটি। শুধু সানি নয়, শত শত তরুণ যুবক বিপ্লবে অংশ নিয়েছে। জাতির জন্য এটা একটা সৌভাগ্যজনক খবর যে, সমাজ গড়ার কাজে বৈজ্ঞানিক মেধা এখন সরাসরি অংশ নিয়েছে।

এখান থেকে ডিগ্রি নিয়েছে নুরুল আম্বিয়া, হাসানুল হক ইনু এবং আরো অনেকে। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি সে শুধু সামাজিক প্রতিপত্তির জন্য নয়, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তারা। মেহনতি মানুষের জন্য দিন রাত খেটে যাচ্ছে সবাই।

সুন্দর একটি পরিবেশে পৌঁছে জাফরের মনে হলো সে ভালো হয়ে গেছে সম্পূর্ণ। কিন্তু তার সাথিরা কিছুতেই তাকে বাইরে বেরুতে দিলো না কয়েকদিন।

দিন চারেক পরে একদিন জাফর বললো-সেবাযত্নে বড্ড কাহিল হয়ে পড়ছি। না বেরুলে আর শরীর মন ঠিক থাকবে না। সবাই জানে আজ আর বাঁধা দিলে তা হবে সরকারের দেওয়া বাধার মতো, কাজে খাটবে না। বিকেল থেকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিলো তারা।

কিন্তু দুপুরে ঘরে ফিরে আর জাফরকে পেলো না কেউ। খবর দিয়ে গেছে খুলনায় চলে যাচ্ছে সে।

দৌলতপুর আর খালিশপুরের শ্রমিক এলাকায় আগেও গিয়েছিলো জাফর। হাড্ডিসার তার সাথিদের দেহ, মলিন চেহারা আর তালি দেওয়া ছেঁড়া জামাকাপড় দেখে আধা ময়লা পোশাকেও লাট সাহেবের মতো লাগে নিজেকে। শ্রমিকদের ক্লান্ত চেহারার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে জাফর। এতো পরিশ্রম করেও তারা পেট পুরে খেতে পায় না, জোটাতে পারে না পরনের কাপড়। তাদেরই রক্ত আর ঘাম ঝরানো পরিশ্রমে ফুলে ফেঁপে উঠছে মালিক শ্রেণি। দিনে আট থেকে দশ ঘণ্টা তাদের কাজ। মজুরি মিলে আট থেকে দশ টাকা। যা এক ঘণ্টার মজুরির সমান, তাহলে কি ঐ সাত থেকে নয় ঘণ্টার উদ্বৃত্ত পরিশ্রমের সুফল লাভ করছে মিল মালিকেরা।

সে বলে-মিল মালিকদের কাছে এ রকম সস্তায় শ্রম বিক্রি করা আর ভূতের বেগার খাটা এক কথা।

জাফর ইউনিটে ইউনিটে গিয়ে শ্রমিকদের সাথে দেখা করে, রাতের বেলায় যায় শ্রমিক বস্তিতে। সুখ-দুঃখের কথা শুনে, গল্প বলে দেশ-বিদেশে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণির। তারপর সবাইকে জানিয়ে দেয় ৮ই ফেব্রুয়ারির কর্মসূচির কথা। জাসদের ডাকে সারা বাংলাদেশে হরতাল হবে সেদিন।

সেদিন ছিলো বোরবার। জাফর সকালে গেছে শ্রমিক বস্তিতে এক সাথীর কাছে। গিয়ে দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে সে।

কি ব্যাপার রফিক ভাই, কি ভাবছেন? উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করে জাফর। বাজারে গিয়েছিলাম চালের দাম একশ' বিশ টাকা থেকে একশ' চল্লিশ টাকা মণ হয়ে গেছে এক রাত্রির ব্যবধানেই।

শুনে চুপ করে থাকে জাফর। পাশের ঘর থেকে আরো দুতিন জন এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। কারো মুখেই রা নেই। অবশেষে রফিকই বলে-একটা বড়ো রকম পরিবর্তন না অইলে আর গতি নাই।

সে পরিবর্তন অইতে অইতে আমাগো দশা শেষ, বুঝলেন রফিক ভাই। লম্বা একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে একজন।

চলো সব রক্ষীবাহিনীতে যোগ দেই।

হেসে পরিবেশ হালকা করতে চেষ্টা করে রফিক। সে জানে তার গায়ে জ্বর এসেছে টের পেলে তার সাথিরা ভয়ে হতাশায় বিছানা নিয়ে ফেলবে। কিন্তু এতো মজার কথাতেও আজ আর হাসে না কেউ।

জাফর বলে-শোষণ আর অত্যাচার যতো প্রকারেই বাড়ুক না কেনো ঐক্যবদ্ধ থাকবেন আপনারা। দিন বেশি দূরে নয়, জয়ী আমরা হবোই।

এমন সময় একজন এসে সংবাদ দিলো গতরাতে হরতালের চিকা মারার সময় মুজিববাদীরা মারধর করেছে তাদের।

আর তোমরা? তোমরা কি করছো তহন? উল্টা মাইর লাগাইলা না কেনো? রাগে চিৎকার করে ওঠে রফিক।

আমাগো তো ভদ্দর লোক বানাইয়া রাখছেন আপনেরাই। আবার কথা কন কেন? পাল্টা রাগ দেখায় সংবাদ নিয়ে আসা লোকটি।

জাফর বুঝে এ অর্থপূর্ণ রাগ। আরো বুঝে, তার কাছ থেকে পাল্টা আক্রমণের সিদ্ধান্তটি পেতে চায় তারা। লোকজন নিয়ে তক্ষুনি সে ছুটে যায় মার খাওয়া কর্মীদের দেখতে। দৌলতপুর, খালিশপুর ঘুরে জাফর রওয়ানা দেয় নওপাড়া, দর্শনা, সৈয়দপুর সেতাবগঞ্জের দিকে। শ্রমিকদের সাথে আলাপ করে বিপুল সাড়া পেয়েছে সে। হাড্ডিসার চেহারার শ্রমিকদের চোখেমুখে সে দেখতে পায় অদ্ভুত দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। পাকশী হয়ে ঢাকায় ফিরেছে গতকাল।

কারখানার শ্রমিকদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার আগে জাফরের ধারণা ছিলো-এরা দুর্বল, নিস্তেজ, শোষিত হতে আর মার খেতেই শুধু জানে- প্রতিবাদ করতে জানে না। কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে- একবার এদের জাগাতে পারলে শোষকগোষ্ঠীকে এরা

দানবের মতো এক ঢোকে গিলে ফেলতে পারবে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় সে-আটই ফেব্রুয়ারির হরতালের পরে সে আর ঢাকায় থাকবে না কিছুতেই। চলে যাবে শ্রমিক এলাকায়, তাদের মাঝেই থাকবে। অশিক্ষিত কিন্তু আন্তরিক এসব লোকগুলোই হচ্ছে বিপ্লবের মূল শক্তি।

হরতাল শেষে সে বেরিয়ে পড়বে শ্রমিক সংগঠনের কাজে। কিন্তু হরতালের তো এখনো তিন সপ্তাহ দেরি। বায়ান্ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি ফেব্রুয়ারি মাস বাঙালি চৈতন্যে প্রতিরোধ চেতনা নিয়ে হাজির হয়েছে। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি হোক চৈতন্যে আরও উজ্জ্বল।

গত ৩০শে ডিসেম্বর পল্টনে জনসভা ছিলো জাসদের। যেখান থেকে ঘোষণা হয়েছে শোষকের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধের আহ্বান। উপস্থিত লক্ষাধিক জনতার রায়ে বলীয়ান সেই ঘোষণা।

২০শে জানুয়ারিতে আবার পল্টনে সভা। জাসদের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে সেখানে। পল্টনের সভার প্রচারণা যখন তুঙ্গে, ঢাকা শহরের লোকেরা অবাক হয়ে শুনলো-মাইকে একই দিনে একই স্থানে জনসভা অনুষ্ঠানের প্রচার চালাচ্ছে আওয়ামী লীগের কর্মীরা। অবাক হয় সকলেই। জোর করে আওয়ামী লীগ। পল্টনে জনসভা করতে চায় নাকি? ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ বাধাতে চায় নাকি পল্টনে?

দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো ঢাকাবাসী জনতার মধ্যে। অফিস-আদালত, কল-কারখানা, বাজার-বিপণীকেন্দ্র, হোটেল রেস্তোরাঁ সর্বত্র সমালোচিত। আওয়ামী লীগের ঘোষণা। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল পুনঃপুন সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে অটল রইলো তাদের সিদ্ধান্তে। আর সরকারকে মোট নব্বই ঘণ্টা সময় দিলো চরম হুঁশিয়ারির। অবশেষে জয় হলো তাদেরই। গণমানুষের চাপে নিজেদের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিলো আওয়ামী লীগ। তাই বলে মজ্জাগত গোয়ার্তুমি কাটেনি আওয়ামী লীগের। ঢাকা শহরে অচিরেই নামিয়ে দিলো অত্যাচারের স্টীম রোলার।

২০ জানুয়ারি সকালে দেখা গেলো সমগ্র পল্টন ময়দান দখল করে নিয়ে বসে আছে খাকি আর সবুজ বর্ণের ইউনিফর্ম পরিহিত বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, বি. ডি. আর এবং রক্ষীবাহিনীর ক্যাডাররা। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সরকারি বাহিনীর সাথে নিরস্ত্র জনতার আড়াআড়িভাব প্রকাশ্য আর স্পষ্টরূপে দেখা স্বাধীনতার পরে এই-ই প্রথম। সরকার ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। মিটিং-মিছিল বেআইনি ঘোষণা করে দিলো। এতদসত্ত্বেও দেখা গেলো বিকেল তিনটা হতে না হতেই জনতার ঢল নামলো পল্টনের চারদিক জুড়ে। মানুষ আর মানুষ। পল্টনে ঢুকতে বাঁধা পেয়ে, পল্টন ঘিরে ছিলো যে সেনাবাহিনী, পুলিশ, আর বি. ডি. আর. তাদেরসহ গোটা পল্টন ঘিরে দাঁড়ালো জনতার ঢেউ। সে কি ঢেউ। ঢেউ এর পরে ঢেউ।

জনতার এ উচ্ছ্বাস দৃষ্টি এড়ায়নি যৌথ বাহিনীর। মুহূর্তে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে তারা। সেনাবাহিনী; বি.ডি. আর আর কতক পুলিশ নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে রইলো একপাশে, যেনো সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে নিয়েছে রক্ষীবাহিনী। মুহূর্তে তারা ছুড়তে লাগলো কাঁদানে

গ্যাস, গুলি। কিন্তু পল্টনের জনতা বাধা মেনেছে এরকম ইতিহাস নেই। একটুক্ষণের জন্য পল্টন হয়েছে ফাঁকা, পরবর্তী দশ মিনিটেই জোয়ার ফিরে এসেছে জনতার। এমনি চলেছে ২০ জানুয়ারির সন্ধ্যে পর্যন্ত।

হিজলার সালেহ আর খালিশপুরের রফিকের কথাগুলো বার বার মনে পড়েছে জাফরের সারাদিন। মানুষের অস্তিত্বের মধ্যেই মারের জবাব দেবার যে সাধারণ প্রবৃত্তি-সালেহ আর রফিক শুধু নয়, কর্মীদের মধ্যে সর্বত্র তা দেখেছে সে। রক্ষীবাহিনীর সন্ত্রাসের মাঝেও জাফর ছিলো তাই প্রবৃত্তিগত আর আদর্শগত সাহসে বলীয়ান। কয়েকশ নির্ভীক কর্মীকে সে পরিচালিত করেছে সেদিন রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে।

সে রাতে আরো একটি দায়িত্ব পালনের চিন্তা আসে জাফরের মাথায়। ঢাকা এবং আশেপাশের সমস্ত মানুষ জানে আজকের পল্টনের ঘটনার কথা। অনেক লোক আহত হয়েছে, গ্রেফতার হয়েছে অগুনতি। জাফরকে নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা করবে রুবীদের বাড়ির সকলে। এমন কি মন্ত্রীর মেয়ে রোজীও। রুবীদের বাসায় একটি সংবাদ পৌঁছানোর তাগিদ অনুভব করলো জীবনে এই প্রথম।

রোজীকেও মনে পড়লো তার। সেবায় যত্নে জাফরকে সুস্থ করেছে সে। মন্ত্রীর মেয়েও কি এতো উদার হতে পারে? জাফরের পাশে নির্ঘুম সারারাত কাটিয়েছে হাসপাতালে পরদিন বাসায় ফিরে বাবা মার কছে কি কৈফিয়ত দিয়েছিলো সে?

'আমি ভালো আছি' কথাটি লিখে একজনের হাতে দিয়ে দিলো জাফর, রুবীর ঠিকানায় কাগজের টুকরোটি পৌঁছে দিতে।

উনিশ অধ্যায়

৮ ফেব্রুয়ারির হরতাল অভাবনীয় সাফল্য লাভ করলো। গোটা দেশের সর্বস্তরের মানুষ জাসদের ডাকে সাড়া দিয়ে সরকারি জুলুম নির্যাতনের মোকাবিলা করেছে সেদিন দুর্জয় সাহসের সাথে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা, অফিস-আদালত, যানবাহন সবকিছু ছিলো বন্ধ। রাজধানী ঢাকা ছিলো জনশূন্য। ছোট ছোট ছেলেরা বড় রাস্তার উপরে মার্বেল খেলেছে সেদিন, নেড়ে কুকুরগুলো আরামসে ঘুমিয়েছে রাস্তার মধ্যে।

দুটো পর্যন্ত ছিলো এই হরতাল। নির্ধারিত সময় শেষ হতে না হতেই রাজধানীসহ বিভিন্ন শহরে নেমেছে বিজয়ী জনতার ঢল।

জনতার এ বিজয়কে মেনে নিতে পারেনি শাসকগোষ্ঠী। দেশব্যাপী শত শত জাসদের কর্মী ও সমর্থকদের বাড়িতে পাগলা কুকুরের মতো হানা দিয়ে রক্ষীবাহিনী যেখানে যাকে পেয়েছে পিটিয়েছে, বেয়নেট চার্জ করেছে, করেছে গুলি। কয়েক শ' কর্মীকে করেছে কারাগারে অন্তর্ধান। গ্রেফতারি পরোয়ানা বের করেছে পাইকারি হারে। ব্যাপকহারে শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে, হরতালে অংশ নেওয়ার শুধু তাই নয়, পোস্তগোলার শ্রমিক বস্তিতে ঢুকে শ্রমিকদের খুঁজে না পেয়ে মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে রক্ষীবাহিনী আর সরকারের ভাড়াটিয়া গুন্ডারা। কয়েকজন তরুণীকে সেখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে জীপে করে।

পরদিন বিশেষ কাজে জাফর গিয়েছিলো নারায়ণগঞ্জের শ্রমিক এলাকায়। সেখানেও শুনতে পেলো একই রকম সংবাদ। শ্রমিক বস্তিতে গিয়ে দেখে, যে ক'টি মেয়েকে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে গিয়েছিলো, তাদের মধ্যে মারা গেছে একজন। আর সংযম নয়। শ্রমিকদের সান্ত্বনা দিতে গিয়ে জাফরের মুখে সেদিন উচ্চারিত হলো প্রতিরোধের কঠিন শপথ। সেখানেই সে ঘোষণা করলো আগামী ১৭ মার্চ শোষকগোষ্ঠীকে ঘেরাও করার কর্মসূচি।

নারায়ণগঞ্জ থেকে সে এলো পোস্তগোলায়। শ্রমিক বস্তিতে পৌঁছতেই ছুটে এলো বস্তির আবাল-বৃদ্ধ- -বনিতা। আবারো এসেছিলো ওরা বুঝতে পারে জাফর। কেউ বললো আমার সব পুড়িয়ে ফেলেছে ওরা। কেউ বললো আমার স্ত্রীকে পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে যেরে রেখে গেছে।' পরক্ষণেই চিৎকার করে উঠলো একজন-'আমার সেয়ানা মাইয়াডারে ধইরা লইয়া গেছে জাফর ভাই। একটা কিছু করেন।'

শিশু-নর-নারীর আর্তনাদ আর ধুঁয়ায় আচ্ছন্ন বস্তির সে এক করুণ দৃশ্য। বোবার মতো দাঁড়িয়ে রইলো জাফর কিছুক্ষণ। ক্ষোভে মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছে তার। বেশি আবেগ আর উত্তেজনার চাপে মানুষ যেমন সব কথা হারিয়ে ফেলে, চোখে ভেসে ওঠে উদাসীনতার ছাপ, জাফরের অবস্থা হলো ঠিক তেমনি। কিন্তু তার উদাসীন দৃষ্টির মাঝে অসহায়ত্বের বদলে ছিলো ক্রোধের আগুন, যে আগুন ছিটকে বেরুলে মুহূর্তে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে অত্যাচারীর আস্তানায়।

আকাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধুঁয়া উঠছে বস্তি থেকে। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এসেছে, তাদের দিকে রাগে তাকাচ্ছে না কেউ। হৈচৈ চিৎকার করে পানি এনে ঢেলে দিচ্ছে নিজেরাই। এক দৃষ্টে কালো ধুঁয়ার দিকে তাকিয়ে জাফর দেখছে-দুস্থ মানবতার প্রতি শাসকদের সে এক নির্মম পরিহাস । দু'তিনটে বুড়ি দু'হাত তুলে চিৎকার করে বিচার চাইছিলো আল্লাহর কাছে। কিন্তু কোথায় সে আল্লাহ? চেঁচিয়ে মহিলা দুটি বলছে- 'তোমার কি চোখ নেই খোদা, তুমি কি অন্ধ? তুমি কি তোমার লীলা নিয়েই বসে আছো, গরিবকে কি দেখো না দু'চোখে?

আর থাকতে পারে না জাফর। চিৎকার করে বলে ওঠে সে-

আর খোদার উপর ভরসা নয়, আর শাসকগোষ্ঠীর নামে নয় যারা আপনাদের রক্ত চুষছে, যারা আপনাদের বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, মা বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে আমরা তাদের উপর প্রতিশোধ নেবো। তিলে তিলে প্রতিশোধ নেবো। আসছে ১৭ মার্চ পল্টন ময়দান থেকে লক্ষ লক্ষ জনতার মিছিল নিয়ে শোষকগোষ্ঠীর আস্তানা ঘেরাও করবো আমরা। রাজি আছেন আপনারা?

চতুর্দিক থেকে সাড়া এলো চিৎকার করে রাজি, রাজি, রাজি।

জাফর বলতে লাগলো আপনারা যাবেন, আপনাদের সবাইকে যেতে হবে। আপনারা শ্রমিক-আপনারাই বিপ্লবের মূল শক্তি। এ দেশকে শোষকের হাত থেকে, জালিমের হাত থেকে মুক্ত করতে হলে শ্রমিক আর কৃষকের রাজত্ব কায়েম করতে হবে। শোষকগোষ্ঠীকে নির্মূল করতে হবে। আর এ নির্মূল অভিযান শুরু করতে হবে আপনাদেরকেই। ১৭ মার্চের সূর্যোদয় এ অভিযান শুরু হবে আমাদের। আপনারা তৈরি থাকুন।'

এরপর সারা বস্তি ঘুরে ঘুরে দেখে জাফর। কারো চোখে তখন আর পানি নেই। আছে জ্বালা, প্রতিশোধস্পৃহায় রুদ্ধ আবেগের যন্ত্রণা।

বিশ অধ্যায়

বউরুটি অনুষ্ঠান হয়েছে ঢাকায়। বউভাতের বদলে বউরুটি-পত্রিকায় এ খবরটি পড়ে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়েন ফরিদা বেগম। জামান সাহেবকে পড়ে শোনালে তিনিও হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতেই বললেন- পত্রিকাগুলো যা মজার মজার খবর ছাপে মাঝে মাঝে।

ফরিদা বেগম বললেন-বর কর্তাই কি কম মজার লোক নাকি। গদবাধা অনুষ্ঠান কি ভালো লাগে সব সময়? তার চেয়ে এ রকম ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠান সত্যিই কতো মজার! লোকটির উন্ন তরুচি আর চমৎকার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছিনে।

তারপর হেসে বললেন-রোজীর বিয়ে দিয়ে ওর শ্বশুরকেও এ রকম একটি অনুষ্ঠান করতে বলবো আমরা।

তার আগে যে বউ হবে তাকে দেখাও খবরটি। মজা পাবে। মেয়ে যে দেখছি তোমার হাসিতেই ভুলে গেছে।

ফরিদা বেগম মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে রইলেন স্বামীর প্রতি। তার চোখ ছলছল করে উঠছে। একটি মাত্র মেয়ে, কেমন যেনো হয়ে গেছে আজকাল। আগের মতো হৈ চৈ করে না, বাপের সাথে জেদ ধরে আগের মতো ঘনঘন বাইরে বেরোয় না। দিনভর ঘরে বসে থাকে। কখনো বই পড়ে, কখনো পিয়ানো বাজায়, কখনো বা বারান্দার রেলিং ধরে দূরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। এ নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলে বলে-পরীক্ষা সামনে, পড়ার চিন্তাতেই তো বাঁচিনে।

কথাটি বিশ্বাসযোগ্য নয় জামান সাহের কিংবা ফরিদা বেগমের কাছে। মেয়েকে তারা ভালো করেই চেনেন-যা জেদি মেয়ে সে! ছেলেবেলায় মা- বাবা দু'জনেরই বকা খেয়েছিলো একবার পালিয়ে চলে গিয়েছিলো নানাবাড়ি। এদিকে তো সবাই তাকে খুঁজে খুঁজেই হয়রান। বিকেল বেলা সংবাদ এলো-রোজী তার নানির কাছে গেছে। তখন কতই বা বয়স হবে তার আট কিংবা নয়। ঐটুকু বয়সে জেদ ধরে বাপকে 'আব্বা' আর মাকে 'মা'' ডাকা বন্ধ করে দিয়েছিলো প্রায় পনেরোদিন। সে কি কষ্ট তখন ফরিদা বেগম আর জামান সাহেবের! কতো কিছু কিনে দিয়েছেন মেয়েকে কতো জামা কাপড় খেলনা; কিন্তু মেয়ের জেদ মেটানো সম্ভব হয়নি। অবশেষে আর কোনোদিন বকতে পারবেন না এ শর্তে নানি তাকে শান্ত করিয়েছিলেন।

রোজীকে ডাকলেন ফরিদা বেগম। এতো ধীর পায়ে সে ঘরে এলো যে পায়ের শব্দ পর্যন্ত শোনা গেলো না। ভড়কে গেলেন জামান সাহেব। কেমন রুগ্ন, ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য হয়ে গেছে মেয়েটা।

এই দেখ মজার এক খবর।

ফরিদা বেগম এগিয়ে দিলেন পত্রিকাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন মজার খবরের অংশটুকু।

রোজী পড়লো। অতি কষ্টে এমন এক ধরনের হাসি সে হাসলো, তা কোন অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ বুঝতে পারলেন না তার বাবা-মা কেউই। ফরিদা বেগম বললেন- কেমন মজার রে! তোর শ্বশুরকেও বলবো বউরুটির অনুষ্ঠান করতে। রোজী পত্রিকার পাতা উল্টাতে লাগলো। ভিতরে একটি পাতা টেনে বের করে তুলে ধরলো তার মায়ের সামনে।

ছড়াটি পড়ে দেখো মা?

জামান সাহেব ভাবলেন বেশ মজা পেয়েছে রোজী, এর চেয়েও চমৎকার কোনো খবর ভেতরের পাতায় আছে বোধহয়। এগিয়ে এসে তিনিও পড়তে লাগলেন ছড়াটি-

'কেমন আছো' কেউ বলে না।

মুখ যে চুনোপুটি।
হলেই দেখা বলছে এখন
'ভাত খেলেনা, রুটি?'

দ্রুত মেয়ের দিকে তাকালেন জামান সাহেব ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে। একটা বিষয়কে কি সহজ ভাবে নিতে পারো না তুমি? তুমি কি বলতে চাও, স্পষ্ট করে বলো দেখি। কণ্ঠে দৃঢ়তা এনে বললেন তিনি।

কিচ্ছু বলতে হবে না চেঁচিয়ে বললেন ফরিদা বেগম। তোর ঘরে যা তুই, শুধু শুনে যা, এরকম বেয়াদবি আমারও ভালো লাগছে না।

কেঁপে উঠলো রোজী। বাপের পা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো

আমাকে মাফ করো, বাবা। আমি বেয়াদবি করছি না। দেশের অবস্থা আমার চেয়ে তুমিই ভালো জানো। দু'বেলা ভাত কে খায় এই ঢাকা শহরে? বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে এক বেলা মাত্র ভাত দেওয়া হয়। কদিন আগে পত্রিকায় দেখেছি-এক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে তুমিই বলেছো বিদেশ থেকেও চাল কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না। দেশের এই অবস্থায় কোনো গরিব বরকর্তা যদি বউরুটির অনুষ্ঠান করেন আর সে খবর যদি পত্রিকায় আসে, এতো লজ্জার বিষয়, আব্বা। আমার হাসি কি করে আসবে বলো। এমনভাবে কথাগুলো বললো রোজী, শুনে জামান সাহেব বুঝতে পারলেন- বিষয়টি নিয়ে মজা পাওয়া সত্যি উচিত হয়নি তার। মেয়েকে পায়ের কাছ থেকে উঠিয়ে বুকে চেপে ধরলেন।

কিন্তু কি হয়েছেরে মা, তুই যে বড্ড কাহিল হয়ে যাচ্ছিস।

ফরিদা বেগমের চোখের পাতা ভিজে এসেছে ততক্ষণে। স্বামীর দিকে তাকাতেই দেখলেন-দু'চোখ দিয়ে টপটপ করে গড়িয়ে পড়ছে জল। জামান সাহেবের চোখে জল! যে স্বামীকে দীর্ঘ পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে কাতর হতে দেখেননি, সংসারের শত দুঃখ-কষ্টেও যিনি বাইরের আমোদ আহ্লাদে কাটিয়েছেন, তার চোখে জল দেখে স্তব্ধ হয়ে গেছেন ফরিদা বেগম।

জামান সাহেবও বুঝতে পারলেন তার দুর্বলতা ধরা পড়ে গেছে স্ত্রী কন্যার চোখে। বাইরে তিনি যতো কঠিনই হোন না কেন, রোজীকে তিনি অন্তর দিয়েই স্নেহ করেন। বললেন-

রুবীদের বাসা থেকে বেড়িয়ে আয়তো মা। ওরা কেমন আছে দেখে আয়। চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় রোজী।

জামান সাহেব চুপচাপ বসে থাকেন চেয়ারে। তার স্ত্রী এসে চোখের পানি মুছে দেন তার।

তুমি বসো, আমি কফি আনছি। বলে ফরিদা বেগমও বেরিয়ে গেলেন। দু'চোখ বুজে এলো জামান সাহেবের। অনেকদিন আগের কথা মনে পড়লো তার।

বাপের এক ছেলে জামান সাহেবের আর্থিক অবস্থা ছিলো মোটামুটি সচ্ছল। বি.এ ক্লাসের ছাত্র তিনি যখন, তখন তার চাচা মারা যান। চাচার ছিলো অঢেল সম্পত্তি। তিনি মারা যেতেই তার বিষয়সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পরে জামান সাহেবের বাবা হাজী রওশন উল্লাহর উপর। বড়ো ভাইয়ের উপর লোভ ছিলো তারও। বিধবা ভাবীকে তিনি অনেক বোঝালেন তাদের একমাত্র মেয়ে ফরিদাকে জামানের সাথে বিয়ে দিলে এ সহায় সম্পত্তি নিজেদের হাতেই থেকে যাবে। কিন্তু বখাটে ছেলে হিসাবে যে পরিচিতি জামানের তাতে সে মহিলা রাজি হলেন না প্রথমে। পরিশেষে কিছুটা ফুসলে আর কিছুটা ভয় দেখিয়ে রাজি করানো হয়েছিলো তাঁকে।

বি. এ পরীক্ষার পরই বিয়ে হয় জামান সাহেবের। ফরিদা বেগম তখন ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্রী।

বিয়ের চার বছরের মধ্যে পর পর তিনটি সন্তান হয়েই মারা যায়। সন্তান লাভের স্বাদ আর মেটে না। মনে ব্যথা আর হতাশা নিয়ে স্ত্রীসহ জামান সাহেব চলে এলেন ঢাকায়। এখানে এসে আইন বিষয়ে একটি ডিগ্রি নেন তিনি। জজ কোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন তারপর।

দু'বছর পর আবারো সন্তান সম্ভবা হলেন ফরিদা বেগম। মানসিক অশান্তি তে এমনিতেই ভেঙে গিয়েছিলো তাঁর শরীর। চতুর্থ সন্তানটিও মৃত হবে-এ দুর্ভাবনায় আরো ভেঙে পড়লেন তিনি।

বড়ো বড়ো ডাক্তারদের কাছে গেছেন জামান সাহেব। পর পর তিনটি মৃত সন্তান প্রসবের কারণ হিসাবে একই বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন প্রত্যেকে। যৌবনে স্বামী যদি মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছৃঙ্খল হন, পৃথিবীর আলো বাতাস সহ্য করার শক্তি থাকে না মাতৃগর্ভের শিশুর। নিশ্চিতভাবে চতুর্থ শিশুটিও মৃত হবে অথবা জন্মেই মারা যাবে-ডাক্তাররা স্পষ্টভাবে একথা বলে দিয়েছেন।

তাহলে যে আমার স্ত্রীও বাঁচবে না এবার! আর্ত কণ্ঠে বলেছিলেন জামান সাহেব। শামীম তখন ডাক্তারি পাশ করে হাসপাতালে যোগ দিয়েছেন। কলেজে জামান সাহেবের দু'বছরের সিনিয়র ছিলেন তিনি। মনে মনে জামান সাহেব ভাবছিলেন-মৃত শিশু জন্মাবার সাথে সাথে অন্য একটি সদ্যোজাত শিশু এনে ফরিদার কাছে রেখে

দেওয়া যেতো যদি এমন তো কত কিছুই গল্পে শুনেছেন। না হয় বাচ্চা চুরির জন্য কিছু টাকা খরচ হবে তার। কিন্তু বন্ধুকে মনের কথা বলার সাহস তার ছিলো না।
ডাক্তার শামীম বললেন তুমি চিন্তা করো না, উপায় আমি বের করবো। ভাবীকে সাবধানে রেখো। কোনো অসুবিধা হলেই সংবাদ দেবে আমাকে। আর হ্যাঁ, তুমি কিছু টাকা রেখো তখন।
জামান সাহেব ভাবলেন-শিশু চুরি হবে, ঠিক যেমন ভেবেছেন তিনি। খুশি হয়ে উঠলেন তিনি। বললেন-টাকা-পয়সার চিন্তা করোনা। সে আমি রেডি রাখবো।

মাসখানেক পর একদিন ব্যথা উঠলো ফরিদা বেগমের। আগের কথামতো জামান সাহেব তাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলেন।
রাত একটার দিকে বাচ্চা প্রসব করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন ফরিদা বেগম। প্রসব করলেন একটি মৃত সন্তান।
একটু ধৈর্য ধরো। বললেন ডাক্তার শামীম।
জামান সাহেব ভাবলেন ডাক্তার শামীম ইচ্ছে করেই বুঝি মৃত সন্তান দেখার সুযোগ দিলেন না তাঁর স্ত্রীকে। তাঁর চোখের সামনে দিয়েই একজন নার্স মৃত শিশুকে সরিয়ে নিয়ে গেলো।
পাশের কেবিনে শরীফ সাহেব নামের এক নিম্নবিত্ত কেরানির স্ত্রী যমজ সন্তান প্রসব করে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।
শরীফ সাহেবের আশা ছিলো একটি পুত্র সন্তান। জন্ম নিয়েছে মেয়ে, তাও আবার একটি নয়-যমজ। ভীষণ মন মরা হয়ে গেছেন তিনি। মনে মনে বললেন-যমজ কন্যা সন্তানের সাথে দু'থলি যৌতুকের টাকা প্রসব করলে আর দুশ্চিন্তা থাকতো না।
ডাক্তারকে মোবারকবাদ জানাতে গিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন-'গরিব কেরানির ঘরে জন্মালো মেয়ে। এ তো আমি সত্যিই চাইনি ডাক্তার সাহেব।'
ফরিদা বেগমের সন্তান প্রসবের কিছুক্ষণ আগে এ ঘটনাটি ঘটে। শরীফ সাহেবের কথাটি মনে রেখেছেন ডাক্তার শামীম জামান সাহেব এবং শরীফ সাহেব দু'জনকে সাথে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য তাঁর অফিস কক্ষে গেলেন তিনি
শরীফ সাহেব প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেননি। ডাক্তার সাহেবের মুখে সব কথা শুনলেন। জামান সাহেব তাঁর দু'হাত জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে বললেন-'আপনি আমার বড়ো ভাই। বাঁচান, দয়া করে বাঁচান আমার স্ত্রীর জীবন। ও যখন হুঁশ ফিরে দেখবে ওর সন্তান মৃত, হার্টফেল করে মারা যাবে এবারে। দয়া করে একটি মেয়ে আমাকে দিন। যেকোনো শর্তে আমি রাজি।
শরীফ সাহবেরও কষ্ট হচ্ছিলো লোকটির কষ্ট দেখে। ভাবলেন-এক মেয়ে দিয়ে আরেক মেয়ের যৌতুকের টাকাটা চেয়ে নিয়ে এখন থেকেই জমা করে রাখা যায়। পরক্ষণেই সামলে নিলেন নিজেকে। 'মেয়ে বিক্রি' কথাটি ভাবতেই লজ্জা পেলেন আগের ভাবনার কথা স্মরণ করে।

বললেন-এক শর্তে রাজি। কাউকে এমন কি আপনার স্ত্রীকেও কোনোদিন বলতে পারবেন না একথা। কোনোদিন না।

রাজি হয়ে আনন্দে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন জামান সাহেব।

একটু পরেই একজন নার্স শরীফ সাহেবের যমজ মেয়ের একটিকে জামান সাহেবের স্ত্রীর কাছে রেখে গেলো। ডাক্তার সাহেবের অফিস কক্ষে বসেই মেয়ে দুটির নাম রাখা হলো রুবী আর রোজী। রুবী হয়েছে প্রথম । কিন্তু ডাক্তার শামীম বললেন-ডাক্তারি হিসাব মতে পরে যে শিশুটি জন্ম নেয় সে- ই বয়োজ্যেষ্ঠ।

হুঁশ ফিরে পেয়ে ফরিদা বেগম তার শয্যাপাশে একটি জীবন্ত শিশু দেখে আনন্দে আত্মহারা হন। সুন্দর ফুটফুটে একটি মেয়ের লাল টুকটুকে মুখ দেখে সব ক্লান্তি মুহূর্তে ভুলে যান তিনি। বুকে জড়িয়ে শিশুটিকে চুমু খেতে থাকেন বার বার।

দরজায় দাঁড়িয়ে জামান সাহেব, শরীফ সাহেব আর ডাক্তার শামীম দৃশ্যটি দেখছিলেন। তিনজনের চোখ থেকে আনন্দাশ্রু ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছিলো। সন্তানের প্রতি মায়ের অসীম মমতা দেখে তিনজনেই মনে মনে শুকুর জানিয়েছেন খোদাতায়ালার দরবারে।

তারপর ধীরে ধীরে বড়ো হতে লাগলো রোজী। দু'বছর পর ফরিদা বেগম আবারো একটি মৃত সন্তান প্রসব করেছিলেন। এরপর আর কোনো সন্তান হয়নি।

সংসারে একটি মাত্র সন্তান থাকলে যা হয়, রোজীর বেলাতেও তাই হয়েছিলো। বাপ-মায়ের অকৃত্রিম স্নেহ-যত্নে মানুষ হয়েছে সে। মেয়ের বয়স যেবার চৌদ্দ, জামান সাহেব বাসা পরিবর্তন করে চলে যান বাসাবোতে, শরীফ সাহেবের বাসার পাশেই। রোজী রুবীর বন্ধুত্ব সেখান থেকেই। দু'জনের চেহারা অবিকল এক। স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে দু'জনেই উনিশ-বিশ সমান। দীর্ঘদিন খুব কাছে থেকে না দেখলে, দু'জনের মধ্যে কে রোজী কে রুবী বুঝতে চেষ্টা না করলে ভুল করে বসাই স্বাভাবিক। তবে, দু'জনের স্বভাবের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য ছিলো। পোশাক পরিচ্ছেদে তো বটেই। দু'জনের মধ্যে ছিলো গলায় গলায় ভাব। রোজী আর রুবীর মা দু'মেয়ে এমন চেহারা দেখে বলতেন-'তোরা যমজ হয়ে জন্মালি নে কেনো? দেখতে একেবারে যমজ যে!"

এসব কথা খুব উপভোগ করতো মেয়ে দুটি। একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেতো।

কিন্তু শরীফ সাহেবের মনের কোণে ছিলো প্রচণ্ড এক ব্যথা, যে ব্যথার কথা কোনোদিন কাউকে জানাননি তিনি। যতোদিন যায়, ততো তাঁর বাড়ে ব্যথা, বাড়ে আক্ষেপ। অন্যদিকে জামান সাহেবের মনে সন্দেহ তিলে তিলে দগ্ধ করে তাঁকে। সব গোপন রহস্য যদি ফাঁস হয়ে যায় একদিন। কিংবা শরীফ সাহেবই যদি দাবি করে বসেন তার মেয়েকে।

এমনি করেই কেটে গেছে দিন। গোপন বিষয়টি গোপনই থেকে গেছে দীর্ঘকাল, কেউ জানতে পারেনি।

সেদিন ডাক্তার শামীমের টেলিফোন পেয়ে চমকে গিয়েছিলেন জামান সাহেব। দীর্ঘ বাইশ বছর পরে রুবী আর রোজী একসঙ্গে ধরা পড়েছে তাঁর চোখে, যিনি এই গোপন রহস্যের প্রধান সাক্ষী। অন্য সাক্ষী সেই নার্স-যার খোঁজ করেও সন্ধান পাননি তিনি। ঘটনার এই দুই সাক্ষীকে বড়ো ভয় তাঁর। নার্সকে নিয়ে দুশ্চিন্তা তাঁর কম। কিন্তু ডাক্তার শামীমকে প্রচুর অর্থ দিয়েও পক্ষে আনা সম্ভব নয়। মনেপ্রাণে তাই তিনি ডাক্তারের মরণ কামনা করেছেন।

রাগের বশে একবার ভেবেছেন-সব ঘটনা খুলে বলবেন তিনি স্ত্রীকে। যে মেয়ে তাদের মেয়ে নয় সে কখনো নকল বাপ-মায়ের মান-মর্যাদার দিকে তাকাবে না। পরক্ষণেই ভেবেছেন-কি লাভ তা প্রকাশ করে? রোজীকে হারানোর ব্যথা তিনি নিজেই সহ্য করতে পারবেন না। তাছাড়া স্ত্রীর মাতৃত্ববোধকে আঘাত করলে একটা অঘটন ঘটে যাবার সম্ভাবনাও কম নয়। এতোদিন মাতৃস্নেহে লালন করেছেন যে মেয়েটিকে আজ যদি বলা হয় সে মেয়েটি আদৌ তাঁর মেয়ে নয়-এ সত্য উপলব্ধির সাথে সাথে চরম হতাশাই নেমে আসা স্বাভাবিক। আর সে হতাশা ফরিদা বেগমের মৃত্যুরও কারণ হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘ বাইশ বছর পরে রোজীও যখন তার জীবনের রহস্যপূর্ণ ঘটনাটি জানবে, তার মনেও জেগে উঠবে চরম দ্বন্দ্বের বেড়াজাল, সৃষ্টি করবে অশান্তি আর অস্থিরতা। সেই অস্থিরতাই হয়তো ভেঙে খান খান করে দেবে জামান সাহেবের গড়া সোনার সংসার।

এবার জামান সাহেব ভাবলেন-ঐ জাফরের সাথেই রোজীর বিয়ে দিতে রাজি হচ্ছি না কেনো? পুলিশের কাছ থেকে জানা গেছে-ছেলেটি জাসদের একজন উঁচুস্তরের কর্মী। প্রচুর নাকি পড়াশোনা আর দেশের সর্বত্র রয়েছে তার যোগাযোগ।

তিনটি বিষয় বিবেচনা করে মনস্থির করে ফেললেন তিনি। প্রথমতঃ রোজী তার ঔরসজাত মেয়ে নয়, নিজের পদমর্যাদা আর অহংকারে আঘাত করবে না বিষয়টি। দ্বিতীয়তঃ জাসদের এমন একজন কেউকেটাকে বশ করে নিজেদের দলে আনা যাবে। তৃতীয় ব্যাপারটি হচ্ছে যা সহায় সম্পত্তি তার আছে, জামাইয়ের আর কিছু না থাকলেও ক্ষতি নাই।

তক্ষুণি ফরিদা বেগমকে ডাকলেন তিনি। বললেন-রোজীকে বলো জাফরের সাথেই ওর বিয়ে হবে।

মানে?

বেশ ভেবেচিন্তেই বলছি আমি। ওর বিয়ে জাফরের সাথেই দেবো। কিন্তু কয়েকটি শর্ত জাফরকে জাসদের রাজনীতি ছাড়তে হবে। আর সে কিছুতেই বলতে পারবে না যে, ভালোবেসে বিয়ে করেছে। বলবে রোজীর বাবার পছন্দে আর তাঁর ইচ্ছাতেই এ বিয়ে হয়েছে।

তাতেই খুশি ফরিদা বেগম। তিনি ধরেই নিয়েছেন এ রকম শর্তে রোজী জাফর উভয়েই রাজি হয়ে যাবে।

রোজীর ঘরে গিয়ে ফরিদা বেগম দেখলেন বিছানায় উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে রোজী। মুহূর্তের মধ্যে মেয়ের মুখে হাসি ফুটাবেন যাদুমন্ত্রের সাহায্যে, এ রকম আশা করে স্বামীর ইচ্ছের কথাটি খুলে বললেন মেয়েকে। বিস্ফারিত চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলো রোজী। তারপর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে হু হু করে কেঁদে উঠলো।

তোমরা এতো ভালো, মা! আমিই তোমাদের ঠিক মতো বুঝতে পারিনি। আরে বোকা মেয়ে, এবার কান্না থামা।

রোজীর দু'চোখের পানি মুছে দিতে দিতে ফরিদা বেগম দেখলেন- রোধ মানছে না তার চোখের পানি।

অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তিনি মেয়ের দিকে।

একুশ অধ্যায়

লাইব্রেরিতে রুবীর সাথে দেখা হয় রোজীর। দু'দিনেই শুকিয়ে গেছে মেয়েটি-মনে মনে ভাবলো রুবী। নিশ্চিন্ত সে এখন জাফর ভালোবাসেনা রোজীকে, যা কিছু জাফরের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে রোজীর প্রতি-সে রুবী মনে করে; সত্যি সত্যি নয়। কিন্তু তাতেই মনে রঙ ধরেছে আর তার সাথে বিয়ে হচ্ছে জেনেই যে রোজী এমন ভারাক্রান্ত এ বিষয়ে রুবী নিশ্চিত।

কি হয়েছে রে তোর? এতো মনমরা কেনো? জিজ্ঞেস করলো রুবী। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। কিছু তো পড়া হয়নি, পড়াশোনার যা চাপ! রুবী জানে, এসবই রোজীর মূল বিষয় এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল। কিন্তু পরক্ষণে রোজী জিজ্ঞেস করলো-জাফরের খবর কিরে? তোর বিয়ে হচ্ছে কবে?

সে তার ঘেরাও কর্মসূচি নিয়েই ব্যস্ত। বিয়ে কি জেলে বসেই করবে কিনা কে জানে।

তোর বাবাকে বলিস জেলে গেলেও যেনো বিয়ের অনুমতি বের করে দেন।

তুইও কি জেলে থাকবি তখন?

মন্দ কি? এক সাথেই থাকবো।

খানিক চুপ করে থেকে রোজী বললো-জানিস, বাবা-মা মনে করেন, জাফর আর আমি পরস্পরকে ভালোবাসি। কোত্থেকে যেনো জাফরের সাথে হাসপাতালে রাত কাটানোর খবর পেয়েছেন। গতকাল সকালে মা এসে বললেন-তোর বাবা মত দিয়েছেন তোদের বিয়েতে।

করুণভাবে হাসলো রোজী। কিন্তু স্থির নিশ্চিন্ত ছিলো বলেই শুনে মজা লাগলো রুবীর। হাসতে হাসতে বললো-

করে ফেল বিয়ে। ভালোই তো মানাবে।

আবারও হাসলো রোজী করুণভাবে। রুবী তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হয়েও তার দুর্বল স্থানে
আঘাত দেবে-এ কথা কল্পনা করেনি সে। স্বার্থের দ্বন্দ্ব এখানে।
রুবীর কিছু করার নেই যদিও তবু সহমর্মিতা আশা করেছিলো রোজী রুবীর হাসি তাই
কাঁটা হয়ে বিধলো। বললো-বাবা বোধহয় লোক পাঠাবেন জাফরের মা-বাবার কাছে।

সম্বিত ফিরে পায় রুবী। প্রকৃতপক্ষে জাফরের সাথে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে
উঠেনি তার। জাফরকে দাবি করার মতো মনের জোরও গড়ে উঠেনি। পারিবারিক
সম্পর্কই যা কিছু সম্বল। রোজীকে তাই আজও তার ভয়। মন্ত্রীর মেয়ে-সংস্কৃতির মানও
রোজীর উঁচু। জাফর তো বলে-বুর্জোয়া সংস্কৃতির সাথে সর্বহারা সংস্কৃতির পার্থক্য
সামান্য। প্রথমটি থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিষয়বোধ-জটিলতা বাদ দিলেই দ্বিতীয়টি
হয়ে যায়। রুবী ভাবে-এ বিচারে জাফর হয়তো রোজীকে কাছাকাছি ভাববে। তাছাড়া
একজন বিপ্লবীর অবচেতন মনেও কি মন্ত্রীর মেয়ের প্রতি দুর্বলতা থাকতে পারে না?
রুবী আরো ভাবে-রোজীর বাবা একজন মন্ত্রী, ঘটক পাঠালেই যদি জাফরের মা-বাব
রোজী হয়ে যান।

সেদিন বাসায় ফিরে রুবীর মন বিষণ্ন। মুখখানি তার এতো মলিন দেখে তার মা
জিজ্ঞেস করলেন-

কি রে অমন শুকনো কেনো তোর মুখচোখ! জাফরের কোনো খোঁজ খবর পেলি আজ?

আমার কি দরকার খোঁজ খবরের! রোজীর বাবা লোক পাঠিয়েছেন জাফরের মা-বাবার
কাছে। রোজীর সাথে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেছে তারা। ঝাঁঝের চোটে একটু বানিয়ে
বলা হয়ে গেলো কথাটি।

সে কি রে? রোজীর সঙ্গে? তা কি করে হয়? তোদের বিয়ে তো ঠিক হয়ে আছে।
তবু মন্ত্রীর ক্ষমতা আর বুদ্ধির সাথে পেরে উঠবেন কি একজন গরিব কেরানি? ভাবতে
লাগলেন সালমা বেগম।

বিকেলে ঘরে ফিরতেই স্বামীকে বললেন রুবীর মুখে শুনলাম, জাফরের সাথে নাকি
রোজীর বিয়ে হচ্ছে-এ কেমন কথা আবার বলোতো?

চমকে উঠলেন শরীফ সাহেবও। নিজেকে হারিয়ে ফেললেন ক্ষণিকের জন্যে। মাথাটা
তার ঝিমঝিম করে উঠলো। নীরবে সিগারেটের ধুয়ো উপরের দিকে ছাড়তে থাকেন
কেবল।

ওকি! কথা বলছো না যে? আমি কালই রোজীর মার কাছে যাবো। এটা একটা কথা
হলো? সালমা বেগম এক মনে কথা বলে যান।

অসম্ভব কিছুই নয়, সবই সম্ভব। তুমি ওখানে যেও না। হোক ওদের বিয়ে সে কি? কি
বলছো তুমি! মাথা ঠিক আছে তো তোমার? জাফর রুবীকে ভালোবাসে, রুবী
ভালোবাসে জাফরকে। তাছাড়া ওর বাবা-মা কথা দিয়েছেন। এ অবস্থায় রোজী আবার
কে? না, তা হতে পারে না। আমি কালই ওদের বাড়ি যাবো। উত্তেজিত হয়ে যান রুবীর
মা।

রোজীর বিয়ে হোক আর রুবীর বিয়ে হোক, সে একই কথা এটুকু বলেই থেমে গেলেন শরীফ সাহেব।

'একি বলে যাচ্ছি আমি মনে মনে বললেন তিনি। নিজেকে সামলে নিলেন তাড়াতাড়ি। বলছো কি তুমি! রোজীর আর রুবীর বিয়ে এক হয় কেমন করে?

একই।

হঠাৎ কণ্ঠে দৃঢ়তা প্রকাশ পায় শরীফ সাহেবের। বললেন-

সব কথা জানতে চেয়ো না। তার চেয়ে বরং জাফরের সাথে রোজীর বিয়েটাই হয়ে যাক। তাতে ক্ষতি নেই আমাদের বরং লাভই হবে। রুবীর মা ভাবলেন-রোজীর বাবা বোধহয় চাপ দিচ্ছেন তার স্বামীর উপর। হয়তো মোটা অঙ্কের টাকাও দিতে চাইছেন এজন্য।

খুলে বলো তো আমাকে সব বললেন রুবীর মা।

স্ত্রীর জেদ দেখে শরীফ সাহেব মুশকিলে পড়ে গেছেন। তাঁর চোখে তখন ভাসছে বাইশ বছর আগে ঘটে যাওয়া ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সেই ঘটনা। না বলা ঘটনার স্মৃতিভার বয়ে আসে তিনি একা, আজ মনে হচ্ছে এ বোঝা একা বহন করার শক্তি তার নেই।

স্ত্রীকে কাছে বসিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলে গেলেন এতোদিনের চেপে রাখা সব কথা।

সব শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকেন সালমা বেগম। বাস্তব, কল্পনা, স্বপ্ন আর রাশি রাশি প্রশ্ন ভিড় জমায় তার মনে। অভূতপূর্ব আবেগ উত্তেজনা আর উচ্ছ্বাসকে তিনি আর ধরে রাখতে পারলেন না। দু'চোখ থেকে অঝোরে ঝরতে থাকে অশ্রু। একি শোকের না আনন্দের বুঝতে পারলেন না তিনি। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বললেন-

এতোদিন কেনো বলোনি এসব? কেনো লুকিয়ে রেখেছিলে এতোদিনে? আমার বুকের ধন কেনো তোমরা কেড়ে নিয়েছিলে সেদিন?

স্ত্রীর আবেগময় কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শরীফ সাহেবের হৃদয়েও বাজতে লাগলো। দু'বাহু বাড়িয়ে স্ত্রীকে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন তিনি। দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘ বাইশ বছরের রহস্যভরা বুকের ভারী পাথরটি তাঁর স্ত্রীর আবেগময় আলিঙ্গনের উত্তাপে গলে গিয়ে ঝরে পড়তে লাগলো দু'গাল বেয়ে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি বলে উঠলেন-

তোমার বুকের ধন আমরা সেদিন সকলে মিলে চুরি করেছিলাম। আমরা অপরাধী, ক্ষমা করো আমাদের।

কিন্তু আমি এখন রোজীকে চাই। ওকে আমার কোলে এনে দাও । আজই, এক্ষুণি।

অমন কথা বলো না। কী লাভ বলে? রক্তের সম্পর্কই বড়ো নয়। রোজী তোমাকে নিজের মায়ের মতো ভাববে এ আশা করো না। ওর মা-বাবা ওকে কম আদর করেন না। ছেলেবেলা থেকে জেনে এসেছে আজ তার উল্টোটা বললেই সে তা মানতে যাবে কেনো?

তবে? কী হবে তাহলে? হতাশায় বুক ভেঙে আসে সালমা বেগমের

রুবী হিংবা কাউকে জানিও না এসব। সময়ই আমাদের জানিয়ে দেবে কি করতে হবে। শুধু একটি কথা দাও আমাকে কাউকে জানাবে না কিছু। কিন্তু রুবীর বিয়ে? জাফরের বাবা-মা মন্ত্রীর কথাতেই রাজি হয়ে যাবেন মনে হয় না। তাছাড়া জাফরের মধ্যে রয়েছে শ্রেণি-চেতনাবোধ, সে কিছুতেই রাজি হবে না। আর যদি সবকিছুই হয়ে যায় রুবীকে সব কথা খুলে বলবো। বোনের কথা ভেবে নিশ্চয়ই মন খারাপ করবে না তখন।

এ তুমি ঠিক বলছো না। ভালোবাসা কখনো কারো খাতিরেই উৎসর্গ করা যায় না। রুবী যদি সব জানেও, তবু সে মেনে নিতে পারবে না। রোজী যদি ভালোবাসে জাফরকে, সেও যেমন পারবে না রুবীকে তার বোন হিসাবে জানলেও।

তাহলে অপেক্ষা করো। আমার বিশ্বাস রোজীর বিয়ে জাফরের সাথে হতে পারে না।

সে রাতে ঘুম আসেনি দু'জনের কারোরই। রোজীকে যে রকম দেখেছেন এতোদিন, যতো ভালো লেগেছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে সব কথা স্মরণে এনেছে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে।

রুবীকে পাঠিয়ে একবার ডেকে আনাও মেয়েটিকে? বললেন শরীফ সাহেব।

সে কি আর সম্ভব! রুবী এখন সব জেনেশুনে ও বাড়িতে যাবে কি করে। একদিন আমি নিজে গিয়েই দেখে আসবো।

উই। তোমাকে বিশ্বাস নেই, কোথায় কি বলে ফেলবে আবার গেলে আমার সাথেই যাবে।

ভোরের দিকে ঘুম এলো দু'জনেরই চোখে ঘুমাবার আগে দু'জনেই আশা করলেন স্বপ্নে দেখবেন তাদের মেয়ে রোজীকে।

বাইশ অধ্যায়

যে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এতো জল্পনা-কল্পনা, সে তার নিজের খবর রাখারও সময় পাচ্ছে না। উল্কার মতো সে ছুটে বেড়াচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায়। ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি, সাধ আহ্লাদ আর বিশ্রামের কথা সে ভুলে গেছে। না আছে খাওয়ার ঠিক, না আছে ঘুমের। কাজ আর কাজ। কাজ ছাড়া এক মুহূর্ত বসে থাকতে পারে না সে। নির্ধারিত কাজ শেষ হলেই বসে যায় কর্মীদের নিয়ে ঘরোয়া আলোচনায়। কর্মীরা চলে গেলে বই হাতে বসে যাবে পড়তে। দেশ- বিদেশের আন্দোলনের ধারা আর বিপ্লবীতত্ত্বের যতো সব বই। অদ্ভুত নেশা আর অদ্ভুত সাধনা এই লোকটির। না ঘুমাতে ঘুমাতে চোখ জোড়া নেশাগ্রস্ত মাতালের চোখের মতো মনে হয়। যেনো এখনই চোখ থেকে ঠিকরে পড়বে রক্ত। জামাকাপড় পাল্টাবার দিকেও খেয়াল নেই তার। ধুলাবালি আর ময়লায় গায়ের কাপড় নোংরা হয়ে গেছে। গোছলবিহীন ঝাঁকড়া কালোচুলে ধুলা-

ময়লায় জট ধরে যাবার উপক্রম। সেভ করার সময় নেই, সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তবু ক্লান্তি নেই তার। ক্লান্তিবিহীন দুর্দান্ত খাটিয়ে এই লোকটিকে সমবয়সি সাথিরা 'জানোয়ার' বলে সম্বোধন করে। জানোয়ারের মতোই খাটতে পারে জাফর। ঘেরাও কর্মসূচি সফল করার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের কাজে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মীসভা, জনসভা শেষ করে জাফর ঢাকায় ফিরে এলো ১৭ মার্চের দু'দিন আগে। আহসানউল্লাহ হলে গিয়ে দেখলো সানি নেই রুমে। দারোয়ান রমিজের কাছেই চাবি থাকে বরাবর। অনেক জরুরি কাজে সানির রুমে আসতে হয় অনেককে। রমিজ তাদের চেনে। কাজ শেষে রমিজের কাছে আবার চাবি রেখে যায়। চাবি দিতে দিতে রমিজ বললো-

সানি ভাই চট্টগ্রাম গেছেন। রুমে আপনার চিঠি আছে।

সানির ঠিকানাতেই চিঠি আসে জাফরের। রুমে গিয়ে দেখলো মায়ের চিঠি। মা লিখেছেন তাকে একবার বাড়ি যেতে। অনেকদিন দেখেননি তো তাই।

চিঠি পড়ে একটি বিষয় জেনে মজা লাগলো তার। রুবী চিঠি লিখে তার মায়ের কাছে অভিযোগ করেছে যে, একবারও ওদের বাসায় যায় না জাফর। তাই আদেশ করেছেন মা, চিঠি পাওয়া মাত্র রুবীদের বাসায় যেতে।

সাহিত্যের ছাত্রী রুবী। নিশ্চয়ই বেশ চমৎকার ভাষায় মাকে চিঠি লিখে পটিয়ে ফেলেছে-মনে মনে ভাবে জাফর। খুশিও হয়।

চিঠি পড়া শেষে মুখের উপর চিঠিখানা মেলে রেখে নীরবে চোখ বুজে থাকে জাফর। তন্দ্রা আসে অল্পক্ষণের মধ্যে। স্বপ্ন দেখে অনেকদিন পর বাড়ি গেছ। সে, তাকে আদরের সাথে জড়িয়ে ধরে তার মা বলছেন 'তুই এলি বাবা, আমি জানতাম চিঠি পেয়েই চলে আসবি তুই। কিন্তু রুবী কই? আমার বউমাকে নিয়ে এলি না কেনো?

জাফর বলছে-আর ক'টা দিন মা। আমি এখন ব্যস্ত। ১৭ই মার্চ ঘেরাও কর্মসূচি আমাদের তারপরই রুবীকে নিয়ে আসবো তোমার কাছে।

এমন সময় রমিজের ডাকে ঘুম ভেঙে যায় তার। রমিজ বললো- গোছল করে নেন জাফর ভাই, আমি খাবার নিয়ে আসবো।

টাকাটা জাফররাই দেয়। রমিজ জানে অনেকদূর থেকে জাফর এসেছে, তার খাবার এনে দিতে হবে।

আমি এখন তোকেই খেয়ে ফেলবো। যা মজার একটা স্বপ্ন দেখছিলাম, তুই হতভাগা আমার সুখটুকু নষ্ট করে দিলি।

হেসে ফেললো রমিজ।

একটু পরে পানি চলে যাবে। তাড়াতাড়ি গোছল করে নিন।

গোসল করতে যাওয়ার আগে মাকে চিঠি লিখতে বসলো জাফর। লিখলো মা, তোমার চিঠি দেরি করে পেলাম। পেয়েই উত্তর লিখছি। আজই রওনা দিতাম, কিন্তু সামনে ১৭ মার্চ, আমাদের ঘেরাও কর্মসূচি ঐদিন। এই তো আর দুটো দিন মাত্র। রুবী

বুঝি তোমার কাছে নালিশ জানিয়েছে, মা! সত্যি কাজের ব্যস্ততায় যেতে পারিনি ওদের বাসায় ১৭ মার্চের প্রোগ্রাম শেষে মানে ১৮ মার্চ সকালেই যাবো ওদের বাসায়। ঠিক যাবো। তারপর তুমি যদি চাও রুবীকে নিয়েই তোমার কাছে চলে যাবো। আর মাত্র দুটো দিন । বাবাকে আমার সালাম জানিও।

স্নেহধন্য
জাফর

মাকে চিঠি লিখে শেষ করতেই জাফরের মনে হলো রুবীকেও একটি দেওয়া যেতে পারে। মাকে যা লিখে দিয়েছে সে কথা রুবীকে লিখলে কেমন হবে? কোনোদিন চিঠি লিখেনি তাকে। অনেক দিন চেষ্টা করেও লিখতে পারেনি। কি এক সঙ্কোচ এসে ভর করেছে সব সময়। আজ লিখবে। অনেক না বলা কথা, প্রতিবাদ, আক্ষেপ, বিক্ষোভ, ব্যর্থতা, স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা এসব নিয়ে লিখবে সে।

গোসল করতে গেলেন না জাফর ভাই? আবার এসে তাড়া দেয় রমিজ। তোর জ্বালায় আর কাজ করা গেলো না। নে, খাবার নিয়ে আয়।

পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে দেয় জাফর। তা দেখে ইতস্তত করে রমিজ। বলে- দু'টাকায় হবে না জাফর ভাই, আপনি তো এ ক'দিন বাইরে ছিলেন। চালের দাম বেড়ে গেছে। এক প্লেট ভাত এখন এক টাকা। সে কি কথা। এই সাত-আট দিনেই দ্বিগুণ হয়ে গেলো?

হলে এখন একবেলা রুটি, একবেলা ভাত। যা দিনকাল পড়েছে।

কিন্তু আমার কাছে যে পয়সা নেই আর। রুটিই নিয়ে আয় তাহলে।

আমার কাছে আছে। নিয়ে আসি আমি।

ঠিক আছে, নিয়ে আয়।

জাফরের মনে পড়েছে-এ রকম বহুবার টাকা দিয়েছে রমিজ। ওর টাকাটা শোধ করা দরকার।

খেয়ে দেয়ে বিছানায় যেতেই রাজ্যের যতো ক্লান্তি এসে ভর করলো জাফরের উপর। কিন্তু আজ যে সে রুবীকে চিঠি লিখবে। 'আজ আমি লিখবোই'-মনে মনে বললো সে। টেবিলের উপর থেকে বড়ো সাইজের খাতাটা টেনে নিয়ে এলো বিছানায়। বালিশের উপর উপুড় হয়ে বসে গেলো লিখতে। কিন্তু কি লিখবে সে? ভাব আর আবেগের চাপ এতো বেড়ে যায় যে, তার কথাগুলো গুছিয়ে আসতে চায় না এলোপাতাড়ি মনের মধ্যে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, প্রবল ঝড়ো হাওয়ায় ধুলাবালি, ছেঁড়া কাপড়, কাগজ, ঝরা পাতা যেমন একাকার হয়ে যায় তেমনি। সেভাবেই লিখে যায় জাফর। লিখতে লিখতে রাত দুটো হয়ে আসে। শেষ বাক্যটি লিখে বার দুয়েক বিড়বিড়িয়ে উচ্চারণ

করে সে- 'প্রিয়তমা, আর মাত্র দুটো দিন, তারপরেই আমি আসবো। ১৮ মার্চের সূর্যোদয়ের সাথেই আসবো, তৈরি থেকে তুমি।'

তারপর ইতি টেনে মার আর রুবীর কাছে লেখা চিঠি দু'খানা আলাদা আলাদা খামে বন্ধ করে তক্ষুনি হলগেটের ডাক বাক্সে ফেলে রেখে এলো।

পরদিন ঘুম ভাঙে তার বেলা এগারোটার দিকে। পাশের রুম থেকে সিরাজ এসে ডাকাডাকি করে জাগিয়ে দেয় তাকে। তাড়াহুড়া করে বিছানা ছেড়ে চোখ কচলাতে কচলাতে জিজ্ঞেস করলো-

কটা বাজেরে সিরাজ?

মোটে এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট। ওঠ তাড়াতাড়ি। আমার রুমে নাসতা আনিয়েছি, খেয়ে নে।

এতো বেলা হয়ে গেলো। কত কাজ বাইরে-বলতে বলতে গামছা নিয়ে বেরিয়ে গেলো গোসলখানার দিকে। ফিরে এলো তিন মিনিটের মাথায়। সোজা সিরাজের রুমে ঢুকলো।

কিরে এতো তাড়াতাড়ি সেরে ফেললি? বিস্মিত হয়ে বলে সিরাজ।

তবে আবার কি? তোদের মতো গোসলখানায় বসে গান গাবো নাকি? অতো সময় আমার নেই বাপু।

আমি তো আর সন্ন্যাসী নই তোর মতো। একবার আয়নায় দেখ তোর মুখের ছিরি গোসলটা সেরে ফেললেই পারতি।

পারতাম। কিন্তু এক্ষুনি বাইরে গিয়ে দুপুরে ফিরবো। তখন গোসল করা যাবে। জানিস গতো দু'মাস আমার গোসল নেই।

ছি ছি ছি। কেনো জানালি কথাটা। এখন তো গন্ধ পাচ্ছি তোর গা থেকে। উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে উগ্রপন্থি হয়ে গেছিস। তিনবার গোসল না করলে তো আমার মাথার তালু পর্যন্ত উগ্রপন্থিদের মতো ফেটে পড়তে চায়।

তোর আর কথা কি? খেতে খেতে কথা বলে জাফর। শিল্পপতির ছেলে তুই, আলালের ঘরের দুলাল।

কিন্তু স্বাধীনতার আগে তো তুই বাবু ছিলি, আর এখন একেবারে সন্ন্যাসী। প্রেমে-ট্রেমে পড়েছিস না কিরে?

প্রেম তো তোদের একচেটিয়া সম্পদ-ধনী শিল্পপতিদের। তবে হ্যাঁ, ক্ষুধার্তদের প্রেমে পড়েছি বৈ কি।

তবে তো তুই বিশ্ব প্রেমিক। আমি বাপু, তোর মতো বিশ্ব প্রেমিক নই। এতোদিন এতো টাকা-পয়সা খরচ করে একটি মেয়েকেই জিততে পারলাম না।

ঐ টাকাগুলো যদি গরিব মানুষের জন্য খরচ করতি, কাজে লাগতো।

তাও তো করি। কয়েকটা পার্টিকেই তো টাকা দিই। তোদেরও তো দিয়েছি। কিন্তু কি লাভ! এদেশের মানুষ কি আন্দোলনে নামবে ভাবিস। সব তো বেইমান, বেইমানদের জন্যে আন্দোলন করেই বা লাভ কি?

এ কথা শুধু তোর মুখেই সাজে। আমার কাছে বলেছিস, অন্য কারো সামনে বলিস নে। বিপদে পড়বি, বুঝলি। এদেশের সব মানুষ বেইমান নয়। বেইমান তারা যারা তোদের মতো ধনী। এদেশে এখনও শত সহস্র দেশপ্রেমিক আছে।

খাওয়া শেষ হয়ে গেছে জাফরের। উঠে যাচ্ছিলো। সিরাজ বললো- আরে বস্, উঠিস না।
না। কাজ আছে। কাল ১৭ মার্চ। এখন কি বসে থাকার সময়।
কি হবেরে কাল?
তা কালকেই দেখতে পাবি।
সারাদেশেই তো তোদের প্রোগ্রামের কথা ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই মনে করছে একটা কিছু হবে। বল না কি হবে।
ঘেরাও।
কাকে?
কালই দেখতে পাবি।

তেইশ অধ্যায়

আজ ১৭ মার্চ, ১৯৭৪ সাল। সকাল থেকেই জাফর খুব ব্যস্ত। রোজী আর রুবী দু'জনেই জাসদের কেন্দ্রীয় অফিসে জাফরকে দু'তিনবার এসে খুঁজে গেছে। কেউই তার দেখা পায়নি।

জাফর আজ অফিসেই আসেনি। বিকেল তিনটায় বিভিন্ন কলেজ থেকে ছাত্র এবং শ্রমিক এলাকা থেকে শ্রমিকদের পল্টনে আনার দায়িত্ব তার। তাই সে খুব ভোরেই কর্মীদের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন কাজে পাঠাতে ব্যস্ত।

বিকেল তিনটায় পল্টনের গণজমায়েতে এলে জাফরের দেখা পাওয়া যাবে এ আশ্বাস রোজী, রুবী উভয়েই পেয়েছে। আজ দু'জনের মনেই চরম অস্থিরতা, জাফরের জন্য দারুণভাবে চিন্তিত ও বিমর্ষ তারা।

কিন্তু জাফর আজ যেনো পৃথিবীর অন্য সব যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন সে ঝড়ের মতো ছুটে চলেছে এ কাজ থেকে ও কাজে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। রাজধানীর বুকে আজ দারুণ উত্তেজনা। সরকারি বাহিনী পাগলা কুকুরের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে, শহরের প্রধান প্রধান সড়কগুলোতে। বেলা ১০টা বাজতেই দেখা গেলো গোটা বিশেক বড় বড় ট্রাক ভর্তি রক্ষীবাহিনী ও পুলিশের আড্ডা জমেছে বায়তুল মোকাররমের

সামনে জাসদের কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে এবং পল্টনের আশেপাশে। বেলা দুটো বাজতে আরো গোটা তিরিশেক ট্রাক ভর্তি সরকারি বাহিনী এলো। এছাড়া প্রধান প্রধান মোড়ে পুলিশ ভ্যানগুলোকে দাঁড়ানো দেখা গেলো। মনে হচ্ছে ওরা যেনো নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার যুদ্ধে নামবে। প্রত্যেকের হাতেই ছিলো আধুনিক অস্ত্র, এস, এল, আর, স্টেনগান, এল, এম. জি. গ্রেনেড। সরকারি বাহিনীকে এরকম যুদ্ধাবস্থায় সজ্জিত দেখে জনসাধারণ কৌতূহলবোধ করলো-এমন যুদ্ধ প্রস্তুতি কাদের ঠেকানোর জন্য?

বিকেল তিনটা বাজতে না বাজতেই বিভিন্ন দিক থেকে জনতার ঢল নেমে এলো পল্টনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পল্টন উপচে লোকজন পার্শ্ববর্তী স্টেডিয়ামের নিচে, উপরে এবং গুলিস্তান বিল্ডিং পর্যন্ত জমাট বেঁধে গেলো।

হাতিয়ার থাকা সত্ত্বেও সরকারি বাহিনীর চোখেমুখে ভীতি ও দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। সাড়ে তিনটায় সভার কাজ শুরু হলো। মেজর জলিল, আ. স. ম. রব, সাজাহান সিরাজ, মোহাম্মদ শাহজাহান, নূরে আলম জিকু প্রমুখ মঞ্চে এসে বসেছেন। জনতার হর্ষধ্বনিও উল্লাসমুখর পরিবেশে এক এক করে সবাই বক্তব্য রাখা শুরু করলেন। আজ সবাই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছেন। সকলের বক্তব্যেই ধ্বনিত হচ্ছে জ্বালাময়ী সংগ্রামী ডাক। পল্টন ময়দানে অবস্থিত জনসমুদ্রও তাদের বক্তব্যের প্রতি বার বার সমর্থন জানাচ্ছে। এ যেনো জনতার ধ্বনি নয়, মহাসমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার গর্জন। নিস্তেজ প্রাণগুলো যখন একত্রিত হয়, তখন তাদের হৃদ-স্পন্দন যে কতো তেজস্বী হয়ে দাঁড়ায়-সে দৃশ্যই মঞ্চের নিচে দাঁড়িয়ে দেখছে জাফর।

আজ আর বক্তৃতার দিন নয়। গণজমায়েত শেষে মিছিল যাবে নির্ধারিত লক্ষ্যে। জাফরের চোখ অস্থিরভাবে মঞ্চের উপর ঘোরাফেরা করছে। হঠাৎ তার দৃষ্টি থমকে গেলো। মঞ্চের সামনে ঘাসের উপরে বসে আছে রুবী তার দিকে তাকিয়ে। অনেক দিন পর আজ আবার তাদের দৃষ্টি বিনিময় হলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য জাফর পল্টনের জনসমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে চলে গেলো। কিন্তু কর্তব্যবোধ তাকে চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য করে। মৃদু হাসিতে সে শুধু অভিনন্দন জানায় রুবীকে।

স্টেয়িয়ামের উপর থেকে রোজী ছোট্ট দুরবীন দিয়ে সব সময়ই জাফরকে অনুসরণ করে ফিরছে। জাফর রোজীকে দেখেনি, দেখাও তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

তখনও মাইকে আওয়াজ ভেসে আসছে-'আজকের গণজমায়েত বাংলার শোষিত, নির্যাতিত, ঝিমিয়ে পড়া মেহনতি মানুষকে শোষকের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তোলার গণজমায়েত। আজকের গণজমায়েত মেহনতি মানুষের ন্যায্য দাবি আদায় করার বাস্তব ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়ার উদাত্ত আহ্বানের গণজমায়েত। আজকের গণজমায়েত থেকেই শুরু হোক শোষকগোষ্ঠীর ভিতকে কাঁপিয়ে তোলার সংগ্রাম-শোষিতের মুক্তি সংগ্রামের প্রথম জয়যাত্রা।

আসুন। বাংলার কৃষক শ্রমিক, ছাত্র সমাজ, চাকরিজীবী, বুদ্ধিজীবী, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতী, নাপিত, ধোপা, মুচি, মেথর, কুলি, রিকশাওয়ালা তথা সর্বস্তরের মেহনতি মানুষ আসুন। আজ এ মুহূর্তে চলুন আমরা শোষকদের বাড়ি ঘেরাও করি। চলুন তাদেরকে জানিয়ে দেই আমাদের দাবি, পেশ করে আসি দাবিপত্র। আজ ঘেরাও হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর বাড়ি। মনসুর আলী মন্ত্রী নয়, একজন কুখ্যাত ডাকাত, হত্যাকারী। তার আদেশে হত্যা করা হয়েছে শত শত তরুণ তাজা যুবক, শূন্য হয়েছে শত শত মায়ের কোল, মুছে গেছে শত শত স্ত্রীর মুখের হাসি।

এ সরকার আর তাদের লেজুড়ে বাহিনীর বিরুদ্ধে শুরু হোক জনযুদ্ধ- জনতার লড়াই। এ লড়াই বাঁচার লড়াই-এ লড়াইয়ে জিততে হবে। চলুন ভাইয়েরা...'

এতোটুকু বলার সাথে সাথেই বক্তারা মঞ্চ থেকে নেমে এলেন। জাফর একটু আগেই গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো বায়তুল মোকাররমের সামনে।

'এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াইয়ে জিততে হবে।' ততোক্ষণে জনতার স্লোগান শুরু হয়ে গেছে। মিছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বাড়ির দিকে যাত্রা করে। এ যেনো মিছিল নয়, এ যে প্রচণ্ড জনস্রোত। উন্মাদের মতো স্লোগান দিতে দিতে জাফর চলেছে মিছিলের অগ্রভাগে। স্লোগানগুলো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে হাজারো লোকের মুখে। বিশ থেকে পঁচিশ হাজার মানুষ এক অভিনব উদ্যম ও উল্লাসের জোয়ারে ধাবিত হয় কুখ্যাত মন্ত্রীর বাড়ির উদ্দেশ্যে।

মিছিলে রুবী শামিল হতে পারেনি। পল্টনের গণজমায়েত শেষেই সে বাসায় ফিরে যায়। যদিও মিছিলে যাওয়ার ইচ্ছে ছিলো কিন্তু অসুস্থতার কারণে তাকে বাসায় ফিরে যেতে হলো। পল্টনে দূর থেকে জাফরকে দেখে তার তৃষ্ণা মেটেনি বরং বেড়েছে দ্বিগুণ। কথা বলতে পারলে হয়তো তার মন কিছুটা হালকা হতো কিন্তু জাফরের ব্যস্ততা দেখে এগোয়নি। বাড়ি ফিরে রুবী কি যেনো এক দুঃখবোধে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। রোজী স্টেডিয়াম থেকে নেমে, মিছিলে মিশে গিয়ে দূর থেকে জাফরকে অনুসরণ করে চলছিলো। জাফর তাকে দেখেনি। অবশেষে মিছিলটি এসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বাড়ির গেটের সামনে ঘিরে দাঁড়ালো। উত্তেজিত জনতার স্লোগান চলছে তখন পুরোদমে। দীর্ঘক্ষণ এমনি ঘিরে রাখার পরে হঠাৎ অসংখ্য অস্ত্রধারী রক্ষীবাহিনী হিংস্র পাগলা কুকুরের মতো ছুটে এলো গেটের দিকে। রাইফেলের বাট ও বেয়নেট দিয়ে জখম করলো অসংখ্য ছাত্র ও জনতাকে। লোকজন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছুটোছুটি শুরু করলো।

মেজর জলিল, আ. স. ম. রব সামনে এসে রক্ষীবাহিনীকে খালি হাতেই বাধা দিতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটে এলো জাফর। অকস্মাৎ শুরু হলো বৃষ্টির মতো গুলি বর্ষণ। এস, এল, আর, স্টেনগান, সবগুলো 'টক টক' ঠুস্ ঠাস্ দুরুম শুরু হলো আপন আপন গতিতে। যেনো শত শত দানব ছুটে আসছে। যে যেখানে পারলো শুয়ে পড়লো। নিরীহ নিরস্ত্র জনতার আর্তনাদ শোনা গেলো চারদিকে। এ যেন যুদ্ধ-মহাযুদ্ধ শুরু হলো। মুহূর্তে গোটা মিন্টু রোডটি একপক্ষীয় যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ নিলো। সন্ধ্যা তখন

সবেমাত্র ঘনিয়ে এসেছে। অন্ধকারের গাঢ় ছায়া তখনো পড়েনি। মাটিতে শুয়ে থাকা অবস্থায় জাফর দেখতে পেলো একটি মেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে তার দিকে আসছে। মনে হচ্ছে রুবী, কিছুটা এগিয়ে এলেই, চিনতে আর অসুবিধা হলো না। এ রোজী। জাফর চিৎকার করে বললো রোজী এদিকে আসবেন না, ওখানেই শুয়ে থাকুন গুলি চলছে, গুলি।

গোলাগুলির প্রচণ্ড আওয়াজে রোজী নামের মেয়েটি শুনতে পেয়েছে কিনা বোঝা গেলো না।

জাফর দেখলো রোজী তবুও হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত কাছে আসছে। সে আবার চিৎকার করে বললো-

রোজী, এদিকে আসবেন না, গুলি লাগবে-এটুকু বলেই জাফর মাটি থেকে দু'হাতে ভর দিয়ে উঠতেই তীক্ষ্ণ একটি চিৎকার করে পড়ে গেলো। রোজীও 'জাফর' বলে চিৎকার করে ছুটে এসে জাফরকে বুকে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করতে থাকে।

ওহ, জাফর কেনো এলে এখানে?

জাফরের বুকের পাজর ফুটো হয়ে উষ্ণ, তাজা রক্ত স্রোতের মতো বের হচ্ছে। কিছুক্ষণ চুপ করে চোখ মেলে উত্তেজিত কণ্ঠে বললো-

আপনি কেনো এলেন? চলে যান। তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালিয়ে যান- ক্লান্ত কণ্ঠে বললো জাফর।

না, না তোমাকে ছেড়ে আমি পালাবো না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছি তোমার সাথে থাকবো বলে। এখন আমার মৃত্যু এলেও তোমাকে এভাবে রেখে যেতে বলো না।

না, পালিয়ে যাও রোজী। আমার জন্য চিন্তা করো না। আমার বুকে গুলি লেগেছে, আমি আর বেশিক্ষণ বাঁচবো না। রুবী কোথায়? রুবীর কাছে কাল সকালে যাবো বলে জানিয়েছি, সে আমার জন্য বসে থাকবে। তুমি ওকে বলে দিও আমায় যেনো ক্ষমা করে।

তুমি একটু চুপ করো। তুমি বাঁচবে, আমি তোমায় হাসপাতালে নিয়ে যাবো। তুমি ভালো হয়ে যাবে। জাফরকে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে সাহস দিয়ে যায় রোজী

না, আমি বাঁচবো না। হ্যাঁ, রুবীকে বলো আমার মাকে যেনো আমার মৃত্যু সংবাদ না জানায়। মা, মা, আর পারলুম না তোমার কাছে ফিরে যেতে, তুমিও আমায় ক্ষমা করো।

হঠাৎ ওদের মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক গুলি চলে গেলো। জাফর চিৎকার করে বললো-মাথা নুয়ে শুয়ে পড়ো রোজী, গুলি লাগবে।

রোজীর মাথা জাফরের বুকে নুয়ে পড়লো তক্ষুনি 'উহ্ উহ্' করে আর্তনাদ করতে লাগলো সে।

এ কি! এ কি হলো রোজী! তোমার যে গুলি লেগেছে, জাফর কোনো রকমে কথা শেষ করে।

ভালোই হয়েছে, তোমার সঙ্গেই হোক আমারও মৃত্যু। তোমার পাশে মরতে পারলেই ধন্য হবো। আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম তোমার সেই গান শুনে-এ লড়াই বাঁচার

লড়াই, এ লড়াইয়ে জিততে..., রোজীর দেহ ঢলে পড়ে জাফরের বুকে। জাফর নিজেও উঠতে পারছে না, বাঁ হাত দিয়ে কোনোমতে রোজীকে ধরে উঠাবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

জাফর চিৎকার করে বলে-

গুলি থামাও গুলি থামাও। সাথিরা এর প্রতিশোধ নিও।

বিন্দু বিন্দু রক্তের হিসাব নিও তোমরা... এ লড়াই চালিয়ে যেও, এ লড়াই বাঁচার লড়াই। ওহ মা, মা, আর পারছি না।

নিস্তেজ কণ্ঠ বুজে এলো জাফরের।

রাস্তায় যেনো রক্তের জোয়ার বইছে। সেই সঙ্গে জাফর আর রোজীর রক্তও মিশে যায়। প্রচণ্ড গোলাগুলি চলছে, অন্ধকার নেমে এসেছে। অন্ধকারে জাফরের কানে মাঝে মাঝে কাতর কণ্ঠ ভেসে আসছে। শেষবারের মতো জাফর রোজীর মাথায় মুখ ছুঁয়ে অস্ফুট স্বরে বলে-

রুবী, রোজী, কেনো আমায় ভালোবাসলে তোমরা তোমাদের যে কিছুই দিতে পারলাম না। তোমাদের চিনতে পারিনি আমি। তোমাদের চিনতে না পারলেও আমি বিপ্লব চিনতে ভুল করিনি। বিপ্লব এদেশে হবেই হবে। আমরা একদিন জিতবোই জিতবো। আমাদের রক্তে জন্ম নেবে শত সহস্র বিপ্লবী...। তারপর আর জাফরের কণ্ঠস্বর শোনা যায়নি। মরণ যন্ত্রণায় সে ছটফট করছিলো, কাতরাচ্ছিলো, গোঙরাচ্ছিলো। তারই বুকের পাশে রোজী তখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে চোখ খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। রাস্তার পাশে দু'জনের রক্ত মাখা দেহ। অদূরে আরো কয়েকটি যুবক- যুবতীর রক্তমাখা স্তব্ধ শরীর পড়ে রয়েছে। রক্ষীবাহিনীর গুলি তখনো থামেনি। গাঢ় অন্ধকারে বীভৎসতা ভৌতিক হয়ে উঠছে। আহতের মরণ আর্তনাদ, রক্ষীবাহিনীর শিকারি চিৎকার, গুলির শব্দ ফালা ফালা করে দেয় রাতের নৈঃশব্দকে।

গোলাগুলি চলার সময়েই পুলিশের একটা ট্রাক এসে তাড়াতাড়ি নিহত আর আহত অবস্থায় যারা গেটের সামনে পড়েছিলো তাদের ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়।

শোঁ শোঁ শনশন করে বইতে থাকে চৈতালী হাওয়া। রাস্তার দু'পাশের গাছগুলো কচি কচি পাতা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে উড়তে থাকে আকাশে। যে সবল তালা হাতগুলো দেয়ালে দেয়ালে স্লোগান লিখেছে এতোদিন সে হাতগুলো বুকের রক্ত দিয়ে শেষ বারের মতো একটি করে স্লোগান লিখে রেখে যাচ্ছে রাজপথে-'বিপ্লবীর মৃত্যু নেই।

অল্পক্ষণের মধ্যেই জাসদের মিছিলের উপর গোলাগুলির খবর ছড়িয়ে পড়ে সারা রাজধানীতে। এ খবর বিছানায় শায়িতা রুবীর কানে পৌঁছতেই দেরি হয়নি। রুবীর মা, বাবা, ববি, প্রত্যেকেই চিন্তিত। গোলাগুলির খবর শোনার সাথে সাথে সালমা বেগম জায়নামাজে বসে গেছেন। দু'হাত তুলে খোদার কাছে, মোনাজাত করছেন-'হায় আল্লাহ, জাফরকে হেফাজত করো তুমি। আমার জাফরকে বাঁচিয়ে রাখো।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে রুবী। সে ভালো করেই জানে মিছিলের অগ্রভাগে থাকবে জাফর। গুলির কথা ভাবতেই বুক কেঁপে ওঠে তার বারবার।

ববি এসে দেখতে পেলো-গালে হাত দিয়ে বসে আছে রুবী আকাশের দিকে তাকিয়ে।

জাফর ভাই-এর চিঠি এসেছে আপা।

কই দেখি। দ্রুত উঠে দাঁড়ায় রোজী।

খামটি রোজীর হাতে দিতে দিতে ববি বললো-বিকেলে দিয়ে গেছে পিয়ন, আমার মনে ছিলো না।

তারপর বললো-জাফর ভাই লিখেছে, তাই না আপা?

তাইতো মনে হচ্ছে।

রুবীও বুঝলো ঠিকানায় জাফরের হাতের লেখা চিনে ফেলেছে ববি। তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়ে বের করলো চিঠিটি। বেশ দীর্ঘ চিঠিটা।

রুবীর পাওয়া জাফরের প্রথম চিঠি। পড়তে থাকে সে-

প্রিয়তমা,

যৌবনে পদার্পণ করে কোনো তরুণীকে এই প্রথমবারের মতো এ নামে সম্বোধন করছি। দশ বছরের কচি কোমল একটি খুকীকে যখন প্রথম দেখে ভালোবেসেছিলাম আমার বয়স তখন বেশি নয়। তারপর গতো বারোটি বছর নীরব সাধনায় কাটিয়েছি আমি। কোনোদিন জানতে দিইনি তোমাকে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর তোমাকে যখন আবারো দেখলাম, আবেগে আপ্লুত হয়ে ঠিক করেছিলাম-ধরা দেবো। ধরা দিতে গিয়ে দেখলাম ধরা পড়েছো তুমিও।

কিন্তু স্বাধীনতার যুদ্ধ আমাকে অন্য একটি বন্ধনে জড়িয়ে নিয়েছিলো আষ্টেপৃষ্ঠে, যে বন্ধন আমাকে মহত্তর জীবনের সন্ধান দিয়েছে। আর একারণেই দীর্ঘদিন এড়িয়ে গেছি। এ রকম এড়ানোর অর্থ তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া নয়। তোমার আমার জীবনকে সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবনের সাথে একাত্ম করার জন্যই আমি ছিলাম ব্যস্ত।

আমি বিপ্লবী হতে পারি, নিঠুর নই, নই কোনো বৈরাগী। আমি রক্ত মাংসেরই গড়া মানুষ। মহা-মানুষ নই অতি সাধারণ মানুষ। আমারও স্বপ্ন আছে, সাধ আছে, মন আছে, মনের আবেগ আছে। কিন্তু এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবনের দিকে যখন তাকাই, দেখি শোষণ, অত্যাচার, দুঃখ- কষ্ট, অভাব-অনটন, ক্ষুধা আর ক্ষুধা। দিকে দিকে যখন দেখি ক্ষুধা আর ক্ষুধিত মানুষ, আমার প্রেম ক্ষুধা তখন গুটিয়ে যায়, নিঃশেষ হয়ে হারিয়ে যায়। ক্ষুধার্ত আম তৃষ্ণার্ত শিশুর বুক ফাটা কান্নায় আমার প্রেম পিপাসা শুকিয়ে যায়। ছেলেহারা মায়ের করুণ আর্তনাদ, ধর্ষিতা বোনের হৃদয় ভাঙ্গা চিৎকার মুহূর্তে চুকিয়ে দেয় আমার কামনা-বাসনা। যে দেশে এতো কান্না, এতো ক্ষুধা, এতো মৃত্যু সে দেশে যৌবন-কামনা অপরাধ বই কিছু নয়। প্রেম সেখানে পাপ, মহাপাপ।

তবে জেনে রাখো প্রিয়তমা-আমি ভীরু নই, পাপকে আমি ভয় করিনে। আমি পবিত্রও নই। মিথ্যা পবিত্রতার আবরণে লুকিয়ে নিজেকে মহাপুরুষ সাজিয়ে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করার বাসনাও আমার নেই। আমি সত্যের সাধক, ন্যায়ের পূজারি। যা সত্য, তাই-ই সুন্দর, সমস্ত সুন্দর সত্য নয়। আমি সুন্দরকে ভালোবাসি। কিন্তু ক্ষুধার দেশে এ ভালোবাসার বাণী শুধুই হেয়ালি, অর্থহীন। মানবতার প্রতি চরম উপেক্ষা করে যে ভালোবাসা তা নিষ্ঠুর নির্মম। তা মানবতার প্রতি উপহাস বৈ কিছু নয়।

আমি শান্তি চাই। জগতের সব বিপ্লবীই শান্তির একনিষ্ঠ পূজারি। কিন্তু মনে রেখো- "শান্তি এক টুকুরো উপহার নয়। এই দাম্ভিক জগতে শান্তি চাইলেই শান্তি মেলে না। শান্তি অর্জন করতে হলে চাই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। এ সংগ্রাম অন্যায় আর অসুন্দরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

সন্ন্যাসীরাও শান্তি চায়। কিন্তু তারা তা চায় সংসার ত্যাগ করে, এ জগতের কিন্তু সব সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে। সমস্যা দেখে জঙ্গলে পালিয়ে যায় তারা, বিপ্লবীরা তা কখনো করে না। কোমর বেঁধে রুখে দাঁড়ায় তারা, জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও সংগ্রাম করে।

তুমি হয়তো মনে মনে ভাবছো-সহসা আমি সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে কেনো ক্ষেপে গেলাম? হ্যাঁ, আমি ক্ষেপেছি। শুধু সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে নয়, আমাদের দেশের ভণ্ড মোল্লা আর মৌলভীদের বিরুদ্ধেও আমার ঐ একই অভিযোগ। আল্লাহ-রসূল আর ধর্মের নামে এদেশের সরল মানুষদের নাকে দড়ি দিয়ে টানছে তারা। গরিবদের জন্য বেহেশত আর ধনীদের জন্য দোজখ-এ ভাওতাবাজি দিয়ে আজও মেষ শাবকের দলের মতো শান্ত করে রেখেছে তারা এদেশের ভুখা-নাঙা মানুষকে, ঠেলে দিচ্ছে তাদের রোগ, শোক, ক্ষুধা আর মৃত্যুর মুখে। আমার মন বিদ্রোহ করে ওঠে এদের বিরুদ্ধে।

মা-বোনেরা ইজ্জত বিক্রি করছে আজ সামান্য পয়সার প্রয়োজনে ক্ষুধার যাতনায়। চোখের সামনে সরকারি বাহিনীগুলো বিনা বিচারে পিটিয়ে পঙ্গু করে দিচ্ছে দুস্থ মানুষকে। চোখ উপড়ে নিচ্ছে, গুলি করে মেরে ফেলছে। চোখের সামনে গরিব শিশুরা না খেয়ে মরছে রাস্তাঘাটে। পচে যাচ্ছে তাদের দেহ। কিন্তু কোনোদিন দেখিনি মোল্লা-মৌলভীদেরকে এ সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, সরকারের বিরুদ্ধে মিছিল করতে কিংবা ভুখা শিশুদের খাওয়াতে। বস্ত্রহীন অভুক্ত নর-নারীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাপ- পুণ্যের বিবরণ শোনানো আর মিথ্যে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া কিছুই করে না তারা। কিন্তু দ্রুত খসে পড়ছে তাদের মুখোশ। অশিক্ষিত সরল মানুষগুলো আজ বুঝতে পারছে-এসবই ওদের ভণ্ডামি। চারদিক দেখে শুনে তাদের মন বিদ্রোহ করে উঠেছে স্রষ্টার বিরুদ্ধে।

কিন্তু সত্যি কথা হলো স্রষ্টার কোনো আলাদা অস্তিত্ব নেই। মানুষের মাঝেই স্রষ্টা, স্রষ্টার মাঝেই মানুষ। স্রষ্টাই সৃষ্টি, সৃষ্টিই স্রষ্টা, তাই এ সৃষ্টিই সব। মানুষই সৃষ্টি মানুষের মাঝে

নিজস্ব গতি আছে। এই গতির সাহায্যেই মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক বস্তুজগতের পরিবর্তন ঘটিয়ে উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। আর এ দায়িত্ব মানুষের হাতেই, কোনো অলৌকিক শক্তির হাতে নয় যুগ যুগ ধরে আমাদের সমাজটাকে তথাকথিত ভাগ্যের শক্ত রজ্জু নিয়ে বেঁধে রেখেছি আমরা। অথচ ভাগ্য মানুষের স্রষ্টা নয়, মানুষই ভাগ্যের স্রষ্টা। তাই ঐ শক্ত রজ্জুটি কাটতে হবে আমাদের। জাতিকে দুর্ভাগ্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে। জাতির ভাগ্য মেহনতি জনতার পরিশ্রম দিয়েই গড়তে হবে।

এ কাজেই নিজেকে নিয়োজিত করেছি আমি। তবে, এ দায়িত্ব আমার একার নয়। জানি না, কতোটুকুন করতে পারবো। তবু এ জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও চেষ্টা করবো ইপ্সিত লক্ষ্যের দিকে পৌঁছতে। এ আমার জীবন মরণপণ।

তোমার কাছাকাছি গেলে অন্য রকম হয়ে যাই আমি। তাইতো ভয় লাগে তোমার ভালোবাসার কাছে যেতে পাছে যদি দায়িত্ব হারিয়ে ফেলি।

আমাদের গোটা সমাজটা আজ এলোমেলো, বিচ্ছিন্ন ঘা ও ক্ষতে জর্জরিত। সমাজকে এ করুণ অবস্থায় রেখে স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন কোনো লোকই ভালোবাসা, গান আর কবিতার জগতে হারিয়ে যেতে, ডুবে থাকতে পারে না। যারা পারে তারা নিতান্তই কাণ্ডজ্ঞানহীন চেতনাহীন, অপদার্থ।

আমার এ ধরনের উক্তিতে তুমি দুঃখ পেয়ো না। আমি চাই ঘরে বসে বসে অলস কল্পনা আর স্বপ্নের মধ্যে আমাকে কামনা করো না; সাথি হয়ে এসো আমাদের-এসো আমাদের মিছিলে। শুধু নর নয়, শুধু নারী নয়, নর-নারী উভয়কেই দায়িত্ববান হতে হবে আজ। অতিরিক্ত দেহ-চৈতন্য মানুষকে শুধু দায়িত্বহীন, কাণ্ডজ্ঞানহীনই করে না, বিকৃতও করে। সামাজিক দায়িত্ববোধই অতিরিক্ত দেহ-চৈতন্যের বিনাশ ঘটাতে পারে।

রাত অনেক হলো, কিন্তু কথাতো শেষ হচ্ছে না। আজ একটি কথা পরিষ্কারভাবে বলে ফেলি তোমাকে, একমাত্র তোমাকেই আমি ভালোবাসি। তবু কি এক অজানা কারণে আমাকে সন্দেহের চোখে দেখো তুমি, নিজে নিজে কষ্ট পাও, অথচ খুলে বলো না আমাকে। রোজী নামটি তোমার মুখে শুনেছি বার কয়েক, আর শুনেছি আমার এক সময়ের বন্ধুর মুখে শুনেছি পি,জি, হাসপাতালের ডাক্তারের মুখে। সেই ডাক্তার আমার কাছে রহস্যপূর্ণ রয়ে গেছেন আজও। তোমার বাবাকে নাকি চেনেন তিনি। মায়া তাকে চিনতে পারেননি, তার সাথে কথা বলেননি, তাতে নাকি কিছুই মনে করেননি ডাক্তার শামীম তোমার আর রোজীর নামটিও নাকি তাঁরই দেওয়া। অথচ এর চেয়ে বেশি বলতে চাইলেন না আর।

সে যাক। রোজীকে তুমি ভেবে বোকামি করেছি বেশ কয়েকবার, কষ্ট দিয়েছি তোমাকে, কষ্ট পেয়েছিও। যখন তাকে স্পষ্ট করে চিনলাম, আমার মাথাটি তখন

তোমার কোলের কাছটিতে। এদেশের মন্ত্রীর মেয়েরও যখন একটি বড়ো হৃদয় আছে দেখেছি আমার বিশ্বাস বিপ্লব এদেশে হবেই।
আর মাত্র একটি দিন তারপরই ১৭ মার্চ। শোষকের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধের বিপ্লবী সূচনার দিন। এ সূচনাতে যদি আমার হয় শেষ, দুঃখ করো না, প্রতিশোধ নিও। বিপ্লবীদের রক্ত বৃথা যেতে দিও না। বেঁচে থাকলে অবশ্যই ১৮ মার্চ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসবো তোমার কাছে। প্রিয়তমা, আর মাত্র দুটো দিন, তারপরেই আমি আসবো। ১৮ মার্চের সূর্যোদয়ের সাথেই আসবো, তৈরি থেকো তুমি।

তোমারই
জাফর

ধীরে ধীরে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় রুবী। সন্ধ্যার কিছু পরেই এ এলাকা থেকে বিদ্যুৎ চলে গেছে। ঘোর অন্ধকারের মাঝে রুবী চেয়ে থাকে অনেক দূরের একটি লাইট পোস্টের দিকে। গন্ধরাজ আর রজনিগন্ধার ঘ্রাণ ভেসে আসছে নাকে। বাইরে চৈতালি হাওয়ার মাতামাতি। মাথার উসকো খুসকো চুল উড়ে এসে পড়ছে তার মুখে। রুবী দাঁড়িয়ে আছে আগামী ভোরের প্রত্যাশায়। কালই তো ১৮ মার্চ। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ছুটে আসবে জাফর রুবীকে নিয়ে যাবে সাথে। মিছিলে যাবে রুবী।

ঐ শোন কিসের আওয়াজ।

'এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে, জিততে হবে, জিততেই হবে-'

আরে! আঁতকে উঠছো কেনো, ওতো গানের আওয়াজ। গান হয় হোক, তবু ভালো, কিন্তু ও যদি হয় শ্লোগান প্রাণ আঁতকে ওঠে।

বাংলাদেশ স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস
জানতে ভিজিট করুন...

www.sottoprokash.com

সত্য প্রকাশ